সাপ্তাহিক

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশিপ

আনন্দমেলা

২১ জুন ২০০০ দশ টাকা

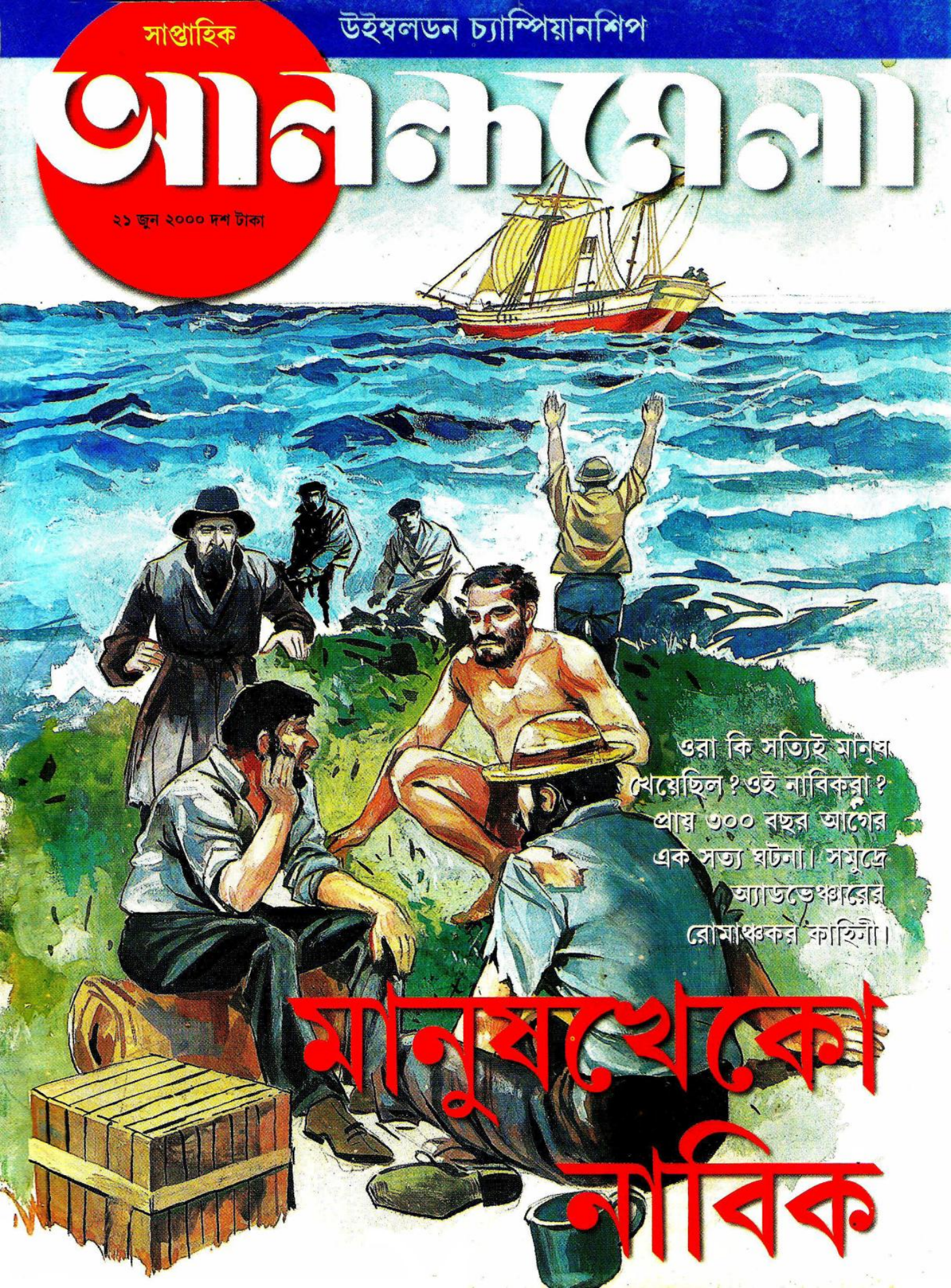

ওরা কি সত্যিই মানুষ খেয়েছিল? ওই নাবিকরা? প্রায় ৩০০ বছর আগের এক সত্য ঘটনা। সমুদ্রে অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

মানুষখেকো নাবিক

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - প্রশান্ত কর্মকার

স্ক্যান করেছেন - প্রশান্ত কর্মকার

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার দুর্লভ / বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটি স্ক্যান করতে চান বা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান

তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

galaxy
2001
LAKMÉ
GlitterGel
LIP
COMET 852
METEOR 857
NOVA 858
MOONBEAM 856
IRIS 853
NAIL
COSMOS 854
ORION 851
VENUS 855
COMET 852
MOONBEAM 856
IRIS 853
ON TOP OF THE WORLD
LAKMÉ
THE MODEL IS WEARING COMET (852) ON HER LIPS AND IRIS (853) ON HER NAILS.
Ambience/ULT/246

২৬ বর্ষ ১০ সংখ্যা ২১ জুন ২০০০ ৬ আষাঢ় ১৪০৭

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

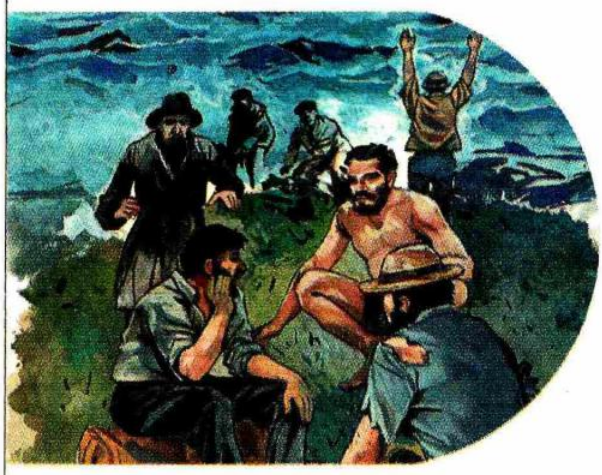

প্রচ্ছদকাহিনী

মানুষখেকো নাবিক

১২ ওরা কি সত্যিই মানুষ খেয়েছিল? ওই ক্ষুধার্ত নাবিকরা? প্রায় ৩০০ বছর আগের এক সত্য ঘটনা। সমুদ্রে অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চকর এই কাহিনী রবিনসন ক্রুশোর গল্পের মতোই। লিখেছেন প্রবীরকুমার মৈত্র।

ভ্রমণ

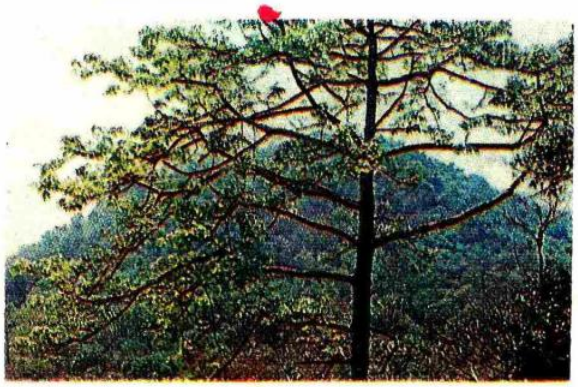

নতুন ঠিকানা দুয়ারসিনি

১৮ পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে দুয়ারসিনি মানুষ আর প্রকৃতির যৌথ উদ্যোগে তৈরি নিবিড় বনভূমি! তারই পাশে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী। নাম 'সাতগুভুম'। চারপাশে জেদি বাইসনের মতো একঝাঁক পাহাড়। এক অপরূপ অরণ্যভূমির কথা লিখেছেন জগন্নাথ ঘোষ।

মাধ্যমিকের লেখাপড়া

এই সংখ্যায় বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক এবং ভূগোল

৩৪ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা ব্যস্ত আবশ্যিক বিষয়ের প্রস্তুতি নিয়ে। তাই এই সংখ্যায় চারটি আবশ্যিক বিষয়ে সেরা শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর এবং পরামর্শ সঠিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে পরীক্ষার্থীদের।

খেলাধুলো

ইউসুফ ইউহানা

৬২ পাকিস্তানের তরুণ ব্যাটস্‌ম্যান ইউসুফ ইউহানা বারবারই জয় এনে দিচ্ছেন পাকিস্তানকে। তাঁর মারকুটে ব্যাটিংয়ে ভেসে উঠছে জাভেদ মিয়াঁদাদের ছায়া। লিখেছেন সুজন ঠাকুরতা।

অন্যান্য বিভাগ

লাভ নেই অকারণ সার্ফ করে • সৌরভ চক্রবর্তী ৪
বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে • ভাস্কর ৬
ফুলদানি ক্লাব • বিমল কর ৭
উন্নত প্রাণীর সন্ধানে অন্য গ্রহে • প্রাণেশ সরকার ১০
মহাকাশ অভিযানে রাশিয়ার সাফল্যও কম নয় • প্রদীপচন্দ্র বসু ২০
পশুপাখিদের সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার নতুন জায়গা জীবাশ্রম • জয় সেনগুপ্ত ২২
অপমান আর লাঞ্ছনায় কেটেছে... • আশিস সান্যাল ২৩
সেকেন্ড মাস্টারমশাই • রঞ্জন প্রসাদ ২৪
হার না মানা হার • প্রবীর জানা ২৭
সুযোগ পেলেই এখনও পড়ি বনজঙ্গলের গল্প • সব্যসাচী চক্রবর্তী ৩১
বিষ্ণুচরণ ঘোষের আখড়ায়... • অশোক রায় ৩২
উপেন্দ্রনাথের আবিষ্কার খুলে দিয়েছিল... • রানা সেনগুপ্ত ৪৫
ধাঁধালি • অমল ভৌমিক ৪৬
খাদিম-এর হজবরল ৫১
কুইজ ৫২
সবুজ পাতা • জয়ন্ত বসু ৫৭
টেলিভিশন ৫৮
বাইরের জানালা ৫৯
উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশিপে কার মাথায় উঠবে... • তানাজি সেনগুপ্ত ৬০
ফুলব্যাক • মানস চক্রবর্তী ৬৩
খেলার খবর • দর্শক ৬৬
নিয়মিত কমিক্স : ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫৪, ৫৬

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

সম্পাদক
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এবিপি লিঃ-এর পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১০ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা, কাঠমাণ্ডু, পোর্টব্লেয়ার, শিলচর, ইম্ফল, গ্যাংটক ৩০ পয়সা।

লাভ নেই

ছবি : দেবাশিস দেব

অকারণ সার্ফ করে

অনেকদিন পরে খুব গভীর চিন্তায় মগ্ন বনিদাদা। এতটাই গভীর যে, বুবুল বা মিঠিদিদি, কারও সাহস হচ্ছে না গিয়ে জিজ্ঞেস করার যে, কী নিয়ে তাদের ইন্টারনেটের গুরু এত চিন্তিত। অবস্থাটা এতই খারাপ যে, মিঠিদিদি একবার গিয়ে বনিদাদার মাকে কথাটা জিজ্ঞেসও করে এল, কিন্তু কাকিমাও বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। "আমি তো ভাবছিলাম তোদের কাছে জানতে চাইব, কিন্তু তোরাও তো দেখছি কিছু জানিস না।"

এইসবের মধ্যে আবির্ভাব সুমনদার। মনে আছে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের সেই পাইলটকে? বনিদাদার জামাইবাবু হলেও, দু'জনের যাকে বলে গলায়-গলায় বন্ধুত্ব। তা বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার কাজটা সুমনদাই করল। "কী রে, গুম মেরে বসে আছিস যে? অফিসে ঝামেলা হয়েছে নাকি?"

ঘণ্টাখানেক পরে মুখ খুলল বনিদাদা, "আরে না না, একটা বিদেশি পত্রিকায় ইন্টারনেট নিয়ে একটা লেখা পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেছে।"

"কেন কী হয়েছে ইন্টারনেটের? শরীর খারাপ নাকি? বল, তা হলে ডাক্তারের খোঁজখবর করি ..." আবহাওয়াটা হালকা করার জন্য বলল সুমনদা। অনেকটা সফলও হল।

"অসুখটা ইন্টারনেটের নয়, অসুখটা হচ্ছে আমাদের, যারা দিনরাত ইন্টারনেট সার্ফ করি। কাজেই, ডাক্তার দেখানো উচিত আমাদের," হালকা হেসে বলল বনিদাদা।

"মানে? ঠিক বুঝতে পারলাম না। ইন্টারনেট থেকে আমাদের অসুখ করছে মানে? ইন্টারনেট কি কোনও সংক্রামক ব্যাধি নাকি যে, সারা পৃথিবীর লোককে অসুস্থ করে দিচ্ছে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সুমনদা।

এর মধ্যে মিঠিদিদির কিন্তু বুবুলকে ইশারা করে দেখানো হয়ে গেছে যে, বনিদাদার মাথা খারাপ। এবং সেটা ভেবে দু'জনে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসাহাসিও হয়ে গেছে। বনিদাদার চোখ এড়াল না সেটা।

"দ্যাখো সুমনদা, লোকে যে যাই বলুক না কেন, এটা কিন্তু আমি ঠাট্টা করছি না। সত্যিই ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক ধরনের ব্যাধি ছড়াচ্ছে। সারাক্ষণ ইন্টারনেট সার্ফ করার অভ্যাস। ক্রমশ এটা একটা রোগের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।" বলে থামল বনিদাদা। পাশে রাখা জলের বোতলটা শেষ করে আবার শুরু করল, "তোমার মনে আছে সুমনদা, প্রথমে যখন বিভিন্ন টিভি চ্যানেল শুরু হয়, তখন যেরকম সমস্যা দেখা দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ বাবা, মনে থাকবে না মানে! লোকেরা তখন সারাদিন-রাত ধরে টেলিভিশনের সামনে পড়ে থাকত। আমার এক বন্ধুর ছেলের তো এমন অবস্থা হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত ডাক্তার দেখাতে হয়েছিল।" সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল সুমনদা।

শুনে উৎসাহে লাফিয়ে উঠল বনিদাদা। "ঠিক বলেছ সুমনদা। বহু লোক আছে যাদের শেষ পর্যন্ত ডাক্তার দেখাতে হয়েছিল। ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও একই জিনিস হতে চলেছে। আমেরিকায় তো ছোটরা এই রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। তারা দিনের মধ্যে বোধ হয় ১৫ ঘণ্টা ধরে সার্ফ করছে। হয় চ্যাট করছে, না হলে কোনও একটা গেম খেলছে অথবা নিদেনপক্ষে কাউকে একটা ই-মেল পাঠাচ্ছে। এই ছোটরা আর কিছু করতেই চাইছে না।"

কথাটা খুব একটা পছন্দ হল না বুবুলের। "কিন্তু বনিদাদা, তার মানে কি ইন্টারনেট সার্ফ করা খারাপ?" প্রশ্ন করল তার ইন্টারনেটের গুরুকে।

"আরে না, না, এখন যা অবস্থা ইন্টারনেট ছাড়া তো বাঁচাই কঠিন। আর তা ছাড়াও ইন্টারনেটের মতো উপকারী আবিষ্কার খুব কম হয়েছে। কিন্তু তাই বলে সারাদিন ধরে আমি ইন্টারনেট দেখব, আর কিছু করব না— এ তো হয় না। একটা কথা ভাব না, তোর বিরিয়ানি খেতে খুব ভাল লাগে। এখন তুই যদি সারাদিন ধরে খালি বিরিয়ানি খাস, তা হলে তোর শরীর খারাপ তো হবেই।" বুঝিয়ে বলল বনিদাদা।

"হ্যাঁ বনিদাদা, ঠিক বলেছ। আমাদের ক্লাসে প্রিয়াঙ্কা বলে একটা মেয়ে আছে, ও বাড়িতে থাকলেই ইন্টারনেট সার্ফ করে গেম ডাউনলোড করে আর খেলে। ওর এমনিতেই চশমা ছিল, আর এখন সারাদিন ইন্টারনেট সার্ফ করে নিজের চোখের একদম বারোটা বাজিয়েছে। পাওয়ার প্রচুর বেড়ে গেছে।" বলল বুবুল। "এই তো দ্যাখ, তুই নিজেই কীরকম ব্যাপারটা খেয়াল করেছিস, বিদেশে তো অবস্থা আরও করুণ," বলে থামল বনিদাদা।

"সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এর থেকে মুক্তির উপায় কী?" এবার প্রশ্ন করার পালা সুমনদার।

"খুব সহজ। বিরিয়ানির ক্ষেত্রেও আমরা যে নিয়ম মেনে চলি— রোজ খাই না, ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও একটি জিনিস প্রযোজ্য। বেশি সার্ফ কোরো না। রোজ করো। কিন্তু প্রয়োজন না থাকলে ঘণ্টাখানেকের বেশি কোরো না।"

তোমরা কী মনে করো?

> এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, ইন্টারনেট ছাড়া বেঁচে থাকাই কঠিন। কিন্তু তাই বলে আর সব কাজ ফেলে তুমি সারাক্ষণ ইন্টারনেট দেখবে— তা তো হয় না। সমস্যাটা কোথায়, বুঝিয়ে বলেছে
>
> **সৌরভ চক্রবর্তী**

বিজ্ঞান
যেখানে যা হচ্ছে

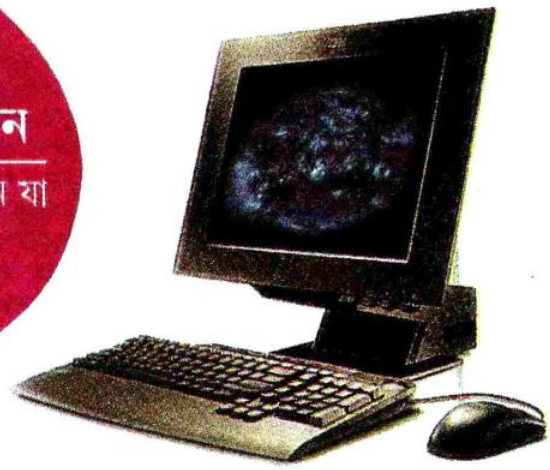

মিনি পিসি

প্রচলিত ডেস্কটপ পিসি-র এক চতুর্থাংশ মাপের কম্পিউটার পেলে অনেকেরই সুবিধে হয়। বিশেষ করে আজকের এই গৃহসমস্যার যুগে ছোট-ছোট ফ্ল্যাটের ছোট-ছোট ঘরের পক্ষে এ ধরনের মিনি-পিসি একেবারে আদর্শ। হয়তো এই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই বিখ্যাত আই বি এম সংস্থা বের করেছে 'নেটভিস্তা'। এই ডেস্কটপ পিসি-র আয়তন মাত্র ১৬×১৬×১০ ইঞ্চি। এতে আছে সিডি এবং ফ্লপি ড্রাইভ, ডিভিডি-রম ড্রাইভ এবং অন্যান্য ব্যবস্থা। দাম ১২০০ থেকে ২৪০০ ডলার।

গাড়ি যখন বাড়ি

গাড়িকেই ঘরবাড়ি করে নেওয়া, আর চলমান সেই গাড়ি নিয়ে যখন যেখানে খুশি চলে গিয়ে দু-চারদিন বা মাস কাটিয়ে আসা এখন আর তেমন কোনও নতুন ব্যাপার নয়। ঢাউস গাড়ির মধ্যেই শোয়া, বসা ও খাবার ঘর, রান্নার জায়গা, বাথরুম, টিভি-ফ্রিজ-ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থা করে নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইউরোপ আমেরিকায় এমন মানুষ বিরল নন। বাড়ির মতো গাড়ির চূড়ান্ত নমুনা ফোর্ডের '২৪-৭'। সংখ্যা দিয়ে যার নাম, সে গাড়ি অবশ্য এখনও পরিকল্পনার স্তরে। কী নেই তাতে? রেলের কাম রার মতো কুপে, ওয়াগন এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত একটি ট্রাক। ইন্টারনেট, ই-মেল, ভিডিও, ফোন ইত্যাদি সব ব্যবস্থাই মজুত করা যায়। যে আয়নায় গাড়ির দু' পাশের দৃশ্য দেখা যায় সেই 'সাইড-সি-মিরর'-এর জায়গায় আছে ক্যামেরা, যার তোলা ছবিতে গাড়ির দু' পাশ ও পেছনের রাস্তা, গাড়িঘোড়া, মানুষ সব কিছুই ধরা পড়বে এবং সে-ছবি ভেসে উঠবে সামনের কন্ট্রোল-প্যানেলে বসানো পরদায়। এই কন্ট্রোল বা ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলও অতি উচ্চ প্রযুক্তির। একুশ' শতকের আধুনিক জীবনযাত্রার যাবতীয় সুযোগসুবিধে মিলবে ফোর্ডের এই গাড়িতে। তবে আপাতত এর বাণিজ্যিক উৎপাদনের কোনও পরিকল্পনা তাদের নেই।

দূর পাল্লার জেট

পৃথিবীর আকাশে প্রথম জেট বিমান উড়েছিল ১৯৩৯ সালের ২৭ অগস্ট। 'হেঙ্কেল-১৭৮' নামের সেই বিমানটি তৈরি করেছিলেন জার্মান প্রযুক্তিবিদ হ্যান্স ভন ওহেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা তখন বেজে উঠেছে। কিন্তু ওই যুদ্ধে জেটবিমান আদৌ ব্যবহার করা হয়নি। 'জেট প্রপালশন' অর্থাৎ বাতাস থেকে বিমানের এঞ্জিনের ভেতর হাওয়া টেনে নিয়ে জ্বালানির সাহায্যে তা গরম করে জেট সৃষ্টি করে বিমান চালনার দ্রুত উন্নতি ঘটে ওই মহাযুদ্ধের পর। এবং এতে নেতৃত্ব দেয় ব্রিটেন। এ ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রবেশ অনেক পরে। মার্কিন বোয়িং কোম্পানির প্রথম জেট প্লেন আকাশে ওড়ে ১৯৫৪ সালে। সেই বিমান ছিল 'বোয়িং-৭০৭'। প্রায় ১৫৩ ফুট লম্বা বিমানটির গতিবেগ ঘন্টায় ৬০০ মাইল, যাত্রী বহনের ক্ষমতা ১৮৯। পরে আরও বড় 'বোয়িং-৭৩৭' বিমান তৈরি হয়, যাতে প্রায় ৩০০ যাত্রী যেতে পারেন। এর পর আসে প্রায় ৫০০ যাত্রী নেওয়ার মতো 'বোয়িং-৭৭৭'। জেট যাত্রী-বিমান তৈরিতে শীর্ষ সংস্থা বোয়িংয়ের মুকুটে এবার সংযোজিত হল আর একটি পালক। বোয়িং-৭৭৭-২০০ এক্স। এ পর্যন্ত দুরতম পাল্লার যাত্রী-বিমান। একটানা ১০ হাজার মাইলেরও বেশি পথ উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে এই বিমানের। নিউইয়র্ক থেকে একবারও না নেমে যাওয়া যাবে কুয়ালালামপুর। বোয়িং সংস্থার আশা, ২০০৩ সালের শেষাশেষি নতুন এই জেট বিমানের বাণিজ্যিক উড়ান শুরু হবে।

ইন্টারনেটে ভিডিও গেম

ইন্টারনেটে লেখাপড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাকাটা, ব্যাঙ্কে লেনদেন, বিনোদন ইত্যাদির পাশাপাশি 'ভিডিও গেম' খেলাও এখন সম্ভব। এজন্য 'মেগা' সংস্থার তৈরি 'ড্রিমকাস্ট' ব্যবস্থা, যার মধ্যে আছে 'ইন-বিল্ট' অর্থাৎ অন্তর্নির্মিত মোডেম সংগ্রহ করতে হবে। এই ব্যবস্থায় 'হোম ভিডিও গেমস' চালান করা যাবে ইন্টারনেটে। এবার দূরের কোনও আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিতজনের সঙ্গে অনলাইন ভিডিও গেম খেলারও সুযোগ মিলবে মেগা-র 'চু চু রকেট' নামে একটি সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে। সেখানেও অবশ্য ড্রিমকাস্ট ব্যবস্থা থাকা চাই দুই খেলুড়ের কম্পিউটারে। নানা ধরনের খেলা আছে এই সফ্টওয়্যারে এবং তা খেলা যাবে 'রিয়েল টাইম' অর্থাৎ একেবারে হাতেনাতে সঙ্গে-সঙ্গেই। সফ্টওয়্যারটির দাম ৩০ ডলার।

উভচর বিমান

মাত্র ছ'জন যাত্রী বহন করতে পারে 'সি স্টার এয়ারক্র্যাফ্ট' কোম্পানির তৈরি উভচর বিমান। উভচর মানে জলে-ডাঙায় নামতে পারে, সেখান থেকে উড়তেও পারে। বিমানটির নামও 'সি স্টার'। আকাশে ২৩ হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচুতে উড়তে পারে। এই বিমানের গতিবেগ ঘন্টায় ২১০ মাইল। টানা এক হাজার মাইলেরও বেশি ওড়ার ক্ষমতা ধরে 'সি স্টার'। দাম ৯০ হাজার ডলার।

ভাস্কর

আগে যা ঘটেছে : ফুলদানি ক্লাবের ছেলেরা দল বেঁধে গেল ইমলিতালাওয়ে সাধুবাবা মহেশ মহারাজের দর্শনে। দূর দূর গ্রাম থেকে গরুর গাড়িতে করে গ্রামের মানুষ এসেছে মহেশ মহারাজকে দেখতে, প্রণাম জানাতে, ভেট দিতে। মহেশ মহারাজের দুই চেলা চিমটেবাবা আর লোটাবাবা। চিমটেবাবার কোমরে ঝুলছে লম্বা চিমটে, লোটাবাবার কোমরে ঝোলে বড় একটা ঘটি। লোটা আর চিমটে মারামারি করছে। তাই দেখে সকলে অবাক। লোটা দুধ চুরি করে খেয়েছে। শাস্তি হিসেবে মহেশবাবাজি নির্দেশ দিলেন, কুড়ি বার নাকখত দিতে। ফুলদানি ক্লাবের ছেলেদের ডেকে মহেশবাবাজি মাথায় হাত দিলেন। সমস্ত মাথার চুল ভরে গেল ছাইয়ে—দেবতার বিভূতি। তারপর ...

ফুলদানি ক্লাব

বিমল কর

শরৎকালে আকাশের ধবধবে সাদা তুলোট মেঘগুলো যেমন ভেসে যায় দেখতে-দেখতে, ভাদ্র-শেষের দিনগুলোও কখন ফুরিয়ে গেল। এমনকী,আশ্বিন মাসের আট-দশটা দিনও। সামনেই পুজো। আর মাত্র বিশ-বাইশটা দিন। পুজোর গন্ধ ছড়িয়ে গিয়েছে মধুগঞ্জে। আমাদের পাড়ায় যে-পুজোটা হয়— তার নাম শিমুলপাড়ার পুজো। আর-একটা পুজো হয় পুরনো বাবুপাড়ায়। এ-পাড়ার পুজোর প্রতিমা গড়া চলছে। মাটি চাপানো হয়ে গিয়েছে খড়ের ওপর, মা দুর্গার কাঠামো প্রায় শেষ।

মনের টান পুজোর দিকে, ওদিকে আবার স্কুলের পরীক্ষা। আমাদের স্কুলের একটা নিয়ম ছিল। গরমের ছুটির আগে আগে হাফইয়ারলি পরীক্ষা হত, আর ডিসেম্বরের গোড়ায়-গোড়ায় অ্যানুয়েল। মাঝে পুজোর ছুটির আগে আধাআধি একটা পরীক্ষা হত, যাকে আমরা বলতাম ক্লাস টেস্ট। মাত্র ক'টা আসল বিষয়েরই পরীক্ষা হত, যেমন অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা। হিন্দির ছেলেরা দিত হিন্দির পরীক্ষা।

এই সময়টায় পড়াশোনার ইচ্ছে থাক না থাক বইখাতা নিয়ে তো বসতেই হত। উপায় কী!

ক্লাব তখন ফাঁকা-ফাঁকা থাকত।

তা সেদিন, শনিবার আমরা অনেকেই ক্লাবে রয়েছি, দুটো পরীক্ষা শেষ, মাত্র একটা বাকি, মন হালকা। প্রতিমা গড়া কতটা এগিয়েছে দেখে ফিরে এসেছি সবে। গল্প হচ্ছে গণেশের ভুঁড়ি, সিংহের মোটা মোটা ঠ্যাঙ নিয়ে, আমাদের পাড়ার প্রতিমায় সিংহটা কোনওদিনই তেজিয়ান হয় না। ঠ্যাঙ মোটাই হোক আর যাই হোক। সিংহের ঠ্যাঙ মোটা হলে সে তো হাতির মতন হয়ে যায়।

এমন সময় বুলুদা এসে হাজির। হাতে গরম পকৌড়া।

"নে খা...! লছমন আজ নিজে দোকানে বসেছে। না, মার্ভেলাস বানিয়েছে রে!"

আমরা পকৌড়া নিলাম।

"তোদের গুরুজির খবর শুনেছিস?"

"আমাদের গুরুজি! মানে মহেশজি?"

"আমি আর জয়দেব কাল গিয়েছিলাম। সাইকেল নিয়ে," বুলুদা বলল। "গিয়ে দেখি, মেলা জমিয়ে ফেলেছে।"

"মেলা?"

"মেলা মানে—ইয়ে ডুগডুগির মেলা নয়, 'মাঘাইয়া' নয়, তোরা কিছু বুঝিস না। ছাগল একেবারে। বলছি, লোকজনের জটলা। তা দশ-পনেরোর বেশিই হবে। সবাই বেশ ভক্তিটক্তি নিয়ে বসে আছে। আমাদের জেন্টুলম্যানরাও দু-চারজন আছেন। বাবুপাড়ার নিমাই মিত্তির, হরিজেঠা, আবার আমাদের পাড়ার কালীমামা, দাসবাবু...।"

পকৌড়াটা সত্যি ভাল। ডালবাটার সঙ্গে পিঁয়াজ লঙ্কাবাটা মিশিয়ে লছমন যে বড়ি সাইজের পকৌড়া করে তার তুলনা নেই। আমরা যে যত পারছি তুলে নিচ্ছি পকৌড়া। বেশ গরম।

ইন্দু হেসে বলল, "তোমরা কি মহেশজিকে পকৌড়া খাওয়াতে গিয়েছিলে?"

"ধ্যাত, তুই একটা গাধা। সাধুরা পিঁয়াজ খায়!"

আমরা হেসে উঠলাম।

বুলুদা বলল, "দেখতে গিয়েছিলাম। এটা আমার সেকেন্ড টাইম। প্রথমবার একটা চক্কর দিয়ে চলে এসেছিলাম। দূর থেকে দেখেছি। এবার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।"

"বসলে না?"

"না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম তোদের গুরুজি লেকচার দিচ্ছে। বলছে, আরে বাবুয়া লোক, সাধুসন্তকি বাত ঝুটা হয় না। তো সে হাজার- হাজার সাল আগে মহাপ্রলয় যব হয়ে গেল তব কী ছিল! কুছ না। নারায়ণজি বটপাতায় শুয়ে-শুয়ে জলমে ভাসছিল। ভাসতে-ভাসতে একদিন সাধ হল নারায়ণজির, তীরথ স্থান বানাবেন। তো কাশী তৈয়ার করে নিলেন। নিয়ে মহাদেবকে বললেন, এই কাশী তোমার, আমি বৃন্দাবন যাব। তো কাশীধামে একবার এক খেপা রাগীসাধু এল। বহুত তপস্যা করেছে। তেজী

মহাপুরুষ। সাধু এসে বললেন, মহাদেব আবার কে? আমিই কাশীতে থাকব। পূজা আমার হবে। শুনে মহাদেব তো হাসলেন। বললেন, মুনিজি ক' যুগ তপস্যা করেছ তুমি? ক' জনম? মুনি বলল, দো যুগ ধুনি চাড়ায়া, এক জনমকা সাধ্না। শুনে হো-হো করে হেসে মহাদেব বললেন, তবে তো তুম্ চুহা।"

"ইঁদুর?"

"একেবারে নেংটি ইঁদুর। বলে মহাদেব তার লেজটি ধরে গঙ্গার জলে ফেলে দিলেন। জলে ভাসতে-ভাসতে মুনি গন...।"

আমরা হেসে উঠলাম।

বুলুদা বলল, "এমন সময় কী হল জানিস? জয়দেব আমায় কনুই দিয়ে গুঁতো মারল। আমি দেখলাম তোদের মহারাজ ভুল বলছে। তখন শুধরে দেওয়ার জন্য বিনয় করে বললাম, মহেশজি পুরাণে অন্য বাত বলে। বলে, এক জনমের সাধনায় মানুষ চিট্টা—মানে পিঁপড়ে হয়, দু'জনমে খটমল্, তিন জনমে চুহা, চার জনমে বিল্লি...। আমায় আর সাত পর্যন্ত এগুতে দিল না মহেশজি। দু'-চার পলক তাকিয়ে থেকে বলল, শাবাশ বেটা। তু পুরাণ জানিস? ঠিক আছে, পরে বাতচিত হবে। এখন বোস।"

কানু বলল, "তুমি মহেশজিকে বললে অত কথা?"

"বললাম। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। তখন তো জানতাম না, পরে পস্তাতে হবে।"

"পস্তাবে কেন?" আমি বললাম।

"তাই তো বলছি। মহেশজিকে যারা দর্শন করতে এসেছিল তারা তো চলে গেল। যাওয়ার আগে মিছরিদানা আর কিশমিশ প্রসাদ পেল। আমাদের থাকতে বলেছিল মহেশবাবা। সকলে চলে গেলে আমাদের দু'জনকে কাছে ডাকল তোদের গুরুজি। হাসি-হাসি মুখ। দু' হাতে তালি বাজিয়ে ভজনের সুরে কী গাইল। লোটা আর চিমটেকে ডেকে কিছু বলল ফিসফিস করে। ওরা চলে গেল। আমাদের বলল, তোরা বহুত লেখাপড়া শিখেছিস! কাজকাম করিস কিছু। দেখি তোদের হাত।...আমরা হাত পেতে দিলাম। মহেশ ঝুঁকে পড়ে হাত দেখতে-দেখতে বলল, আরে এ ছোকরা, কী নাম তোর? বললাম, বুলু। মহেশ বলল, তুই পয়সা কামাবি মুঠিয়া ভরতি। রাখতে পারবি না। তোর দৌলত হবে, মাগর শেষতক তুই ফকির হয়ে যাবি। দানধ্যান করবি।...আর তুই? কী নাম তোর? জয়দেব। তোর বিজনেস! লছমি তোর হাতে বেটা। ষাট সাল পার করে একটা ধাক্কা আছে। উতরে যাবি। তুই সাদাসিধে থাকবি। পয়সা ওড়াবি না।"

"তোমরা কী বললে?"

"কিছু বললাম না। ওর বোলচাল শুনছিলাম। একবার ভাবলাম বলি, মহারাজ আমি কলকাতার জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে টরে-টক্কা পাশ করে চাকরির ধান্দায় বসে আছি। রেলে ডাক পাব কবে কে জানে! বাবার হোটেলে দিন কাটছে। আর জয়দেব বিজনেস করবে কী! ওর হিসেবজ্ঞান নেই, আলু-পটল কিনতে গেলে ঠকে যায়!"

কথাটা অবশ্য ঠিক। জয়দেবদা ভীষণ গোবেচারি মানুষ। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে নেয়।

মহেশ দু'হাতে তালি বাজিয়ে একটা পেঁড়া বার করল। ভাগাভাগি

বুলুদা বলল, "তারপর আমরা যখন উঠব-উঠব করছি, মহেশ দু' হাতে তালি বাজিয়ে একটা পেঁড়া বার করল। ভাগাভাগি করে দিল আমাদের। প্রসাদ। বলল, খেয়ে নিবি। হাতে নিয়ে দেখি কর্পূরের গন্ধ।"

"খেলে?"

"মুখে দিলাম। গয়ার পেঁড়া বলে মনে হল।...উঠে পড়ে চলে আসছি হঠাৎ মহারাজ বলল, এই মন্দিরটা কবেকার জানিস? জানি না। মাথা নাড়লাম। অনেক পুরনো।"

"মহারাজ হঠাৎ মন্দিরের কথা তুললেন কেন? আমাদেরও বলেছিলেন মন্দির সারাবার জন্যে কে টাকা দিতে চেয়েছিল, উনি নেননি।"

বুলুদা বলল, "তারপর শোন কী হল? বার্ কয়েক মন্দিরের কথা তুলল। আমরা ভেতরটা দেখেছি কিনা জিজ্ঞেস করল। আমরা বললাম, ভাঙা মন্দির, ভেতরে সাপখোপ কত কী আছে—কোন সাহসে দেখব! কেউ দেখে না। আমরাও দেখিনি। বলে চলে আসছি। সাইকেল তুলে নিয়ে চড়তে যাব—দেখি আমার সাইকেলের সামনের চাকায় হাওয়া নেই। আর জয়দেবের সাইকেলের পেছনের চাকায়। দুটোই চুপসে গেছে। ব্যস,হয়ে গেল।বোঝো ঠেলা।"

"চাকার হাওয়া..."

"ওই বেটা লোটা আর চিমটের কীর্তি! বুঝতে পারলাম, গুরুর পরামর্শে ওই চেলা দুটো আমাদের টাইট দিয়েছে।"

"মহেশজিকে বললে না?"

"কোথায় তোর মহেশজি! তালাওয়ে চলে গিয়েছে। কী ডেঞ্জারাস লোক রে! সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে বাড়ি ফিরলাম।"

আমরা হাসতে লাগলাম।

বুলুদা বলল, "এক মাঘে শীত পালায় না। দাঁড়া দেখবি আমি কী করি! ওই বেটা চিমটে বাজারে এলে ষাঁড় লেলিয়ে দেব। ওটার যা চেহারা আর সাজ, ষাঁড়ের চোখে পড়লেই হল একবার!"

বুলুদা ষাঁড় লেলিয়ে দিলে চিমটের অবস্থা যে কাহিল হবে সন্দেহ নেই।

উঠে পড়ল বুলুদা।

"মহেশবাবাজির হঠাৎ মন্দির নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন বলতে পারিস?"

"না।"

"খোঁজ লাগাতে হবে।...ভাল কথা, আমাদের এদিকে ছিঁচকে চোর বেরিয়েছে জানিস?"

"না।"

"প্রায়ই থালাবাটি, বাইরে শুকোতে দেওয়া কাপড়জামা চুরি হচ্ছে। কে চুরি করছে, ধরতে হবে। এ-বেটা নতুন আমদানি। একবার ধরতে পারলে বেটাকে দেখিয়ে দেব!"

ইন্দু বলল, "বুলুদা, ছিঁচকে চোর কোথায় না থাকে! তার ওপর পুজোর সময়...।"

"ছিঁচকেরাই পরে পাকা হয়।" বুলুদা একটা ধমক মেরে বেরিয়ে গেল। ক্লাবের মধ্যে ততক্ষণে ঝাপসা হয়ে এসেছে।

(ক্রমশ)

করে দিল আমাদের। প্রসাদ। বলল, খেয়ে নিবি।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

উন্নত প্রাণীর সন্ধানে অন্য গ্রহে

গ্রহে-গ্রহান্তরে প্রাণের স্পন্দনই শেষ কথা নয়। সেখানে কি মিলতে পারে কোনও উন্নত প্রাণীর সন্ধান—'পরশ পাথর'-এর খ্যাপার মতো বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসার সারবত্তা কতখানি? কতদূর সফল তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা?

আলোচনা করেছেন

প্রাণেশ সরকার

যে সব বিজ্ঞানী পৃথিবী ছাড়াও অন্য কোনও গ্রহে উন্নত প্রাণীদের সন্ধান করে ফিরছেন, তাঁদের বেশ জোরালো ধাক্কা দিয়েছেন দুই মার্কিন অধ্যাপক। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিটার ওয়ার্ড ও ডোনাল্ড ব্রাউন্‌লি বিস্তর গবেষণার পর জানিয়েছেন, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও উন্নত প্রাণীর অবস্থানের সম্ভাবনা 'সোনার-পাথরবাটি'র মতোই অসম্ভব। ওয়ার্ড ও ব্রাউন্‌লির এই গবেষণার ফল যে 'নাসা' ও 'সেটি' (সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স)-এর মতো বেশ কিছু সংস্থার বিজ্ঞানীদের, যাঁরা অনেকদিন ধরে এই কাজ করছেন, কিছুটা হলেও হতোদ্যম করে দেবে এতে সন্দেহ নেই।

দীর্ঘদিন ধরে সেটি'র বিজ্ঞানীরা মহাকাশে ভিনগ্রহের উন্নত প্রাণীদের 'রেডিও সিগন্যাল'-এর সন্ধানে ব্যস্ত। এর জন্য তাঁরা পোর্তো রিকোর অ্যারেসিবোতে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ 'রেডিও টেলিস্কোপ' বসিয়েই ক্ষান্ত হননি, ম্যাসাচুসেট্‌স-এ তৈরি করা হচ্ছে ৮৪ ফুট উঁচু এক স্যাটেলাইট ডিশ, যার সাহায্যে সেটির হার্ভার্ড শাখার বিজ্ঞানীরা মহাকাশের রেডিও সিগন্যালগুলির প্রতিটিকে পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে 'ই. টি.'দের বার্তা খুঁজবেন। সেটি'র প্রধান জিল টার্টার কিন্তু এই কাজে সাফল্যের বিষয়ে প্রচণ্ড আশাবাদী। তিনি বলেছেন যে, আমাদের এই ছায়াপথের বাইরেও কয়েকশো বিলিয়ন নক্ষত্রের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং কেউ হলফ করে বলতে পারবেন না, এই বিশাল এলাকায় পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও গ্রহেই উন্নত প্রাণীরা বাস করে না। তাই এত তাড়াতাড়ি হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে ধরা যেতে পারে ভিনগ্রহবাসীদের পাঠানো বেতারসংকেত

ভিনগ্রহের উন্নত প্রাণীদের সন্ধানে শুধু সেটি'ই নয়, ব্রিটেনে অবস্থিত রাদারফোর্ড অ্যাপ্‌লটন ল্যাবরেটরির অ্যালান পেনিও এই একই কাজ করছেন। তিনি এমন একটি টেলিস্কোপ মঙ্গল ও জুপিটারের মধ্যে স্থাপন করতে চান, যা দিয়ে ৫০ আলোকবর্ষ দূরের

গ্রহগুলিতেও নজর রাখা যায়। এদিকে নাসা'ও একটি নতুন কর্মকাণ্ডে হাত দিতে চলেছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'টেরেস্ট্রিয়াল প্ল্যানেট ফাইন্ডার', যার লক্ষ্য হল পৃথিবীর মতোই আকার, আয়তন, প্রাণের পক্ষে অনুকূল পরিবেশবিশিষ্ট গ্রহগুলি খুঁজে বের করা।

এই সব উদ্যোগের পেছনে যিনি আছেন, তাঁর নাম, ফ্রাঙ্ক ড্রেক। ১৯৬১ সালে তিনি বিস্তর গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, পৃথিবী ছাড়াও অন্য গ্রহে উন্নত প্রাণীর অবস্থান অসম্ভব নয়। যেটি 'ড্রেক ইকুয়েশন' নামে বিখ্যাত। ড্রেকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কার্ল সাগান নামে এক লেখক লিখে ফেলেছিলেন কিছু সাহিত্য।

কিন্তু দীর্ঘদিনের এই বিশ্বাসের মূলে আঘাত করেছেন ওয়ার্ড ও ব্রাউন্‌লি। তাঁরা যদিও অন্য কোনও গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেননি, কিন্তু এই রেডিও সিগন্যাল অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে যে ধরনের উন্নত প্রাণীদের সন্ধান করা হচ্ছে, ওয়ার্ড ও ব্রাউন্‌লির মতে তা অলীক কল্পনা। তাঁদের বক্তব্য, সূর্য সমস্ত নক্ষত্রের মধ্যে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এটি ৯৫ শতাংশ নক্ষত্রের চেয়ে আকারে ও আয়তনে অনেক বড়। এবং বহু বছর ধরে আকার ও আয়তন সমান রেখে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। ভাগ্যক্রমে পৃথিবী নামে গ্রহটি সূর্য থেকে এমন একটা দূরত্বে অবস্থান করে, সেখানকার উষ্ণতা প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল। এই ধরনের উষ্ণতা এই সৌরজগতের বাইরে কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। কারণ অন্য সৌরজগতে বহু নক্ষত্র থাকতে পারে, কিন্তু তাদের একটিও 'সূর্য' নয়।

পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের আকার ও আয়তন যে-কোনও অন্য উপগ্রহের চেয়ে বেশ বড়। এই বিষয়টিকে ওয়ার্ড ও ব্রাউন্‌লি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, এর ফলে পৃথিবীর পক্ষে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথ বজায় রাখা সম্ভব হয়। এ ছাড়াও পৃথিবীতে বিভিন্ন ধাতুর ব্যাপক উপস্থিতিও যে উন্নত প্রাণীর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তা এই দুই অধ্যাপক-গবেষক মনে করিয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে তরল লাভা আছে, তার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের যে সংঘাত চলেছে, তাও মানুষের মতো উন্নত প্রাণীর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলেই মনে করেন ওয়ার্ড ও ব্রাউন্‌লি। এই সংঘাতের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে পর্বত ও মহাদেশগুলি। সৃষ্টি হয়েছে গভীর খাদ, যাতে জল জমেই জন্ম নিয়েছে মহাসাগরগুলি, যা প্রাণসৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই জাতীয় সংঘাত কিন্তু অন্য কোনও গ্রহে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

আরও একটি বিশেষ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ওয়ার্ড ও ব্রাউন্‌লি। আমাদের সৌরজগতের তুলনায় অনেক কম নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়। অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও যদি বিশাল সংখ্যক নক্ষত্র থাকত তা হলে হয়তো এতদিন আমাদের কোনও 'সুপারনোভা'র আঘাতে ধরাশায়ী হতে হত। যাই হোক, আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, পৃথিবীর অবস্থান সবদিক থেকেই প্রাণের পক্ষে আদর্শ। এটি মঙ্গলের মতো শীতলও নয়, আবার শুক্রের মতো উষ্ণও নয়।

ওয়ার্ড ও ব্রাউন্‌লি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, তিন বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে যে ধরনের নিম্নমানের

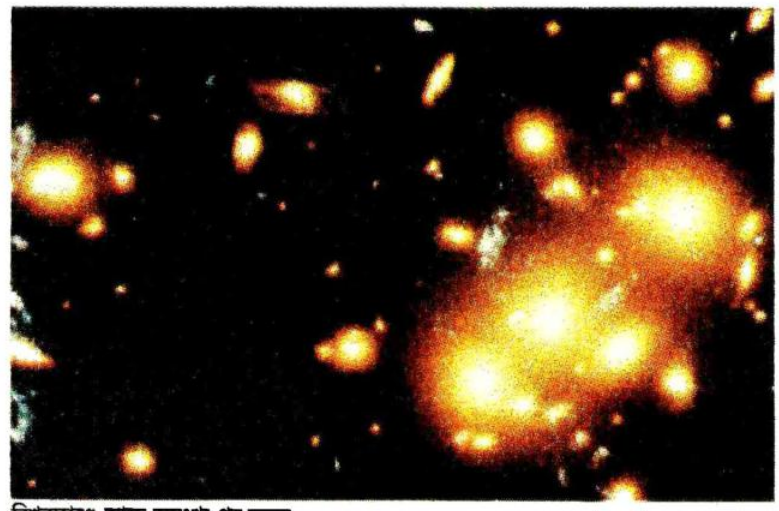

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র

প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল তা অন্য কোথাও থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ৬০০ মিলিয়ন বছর আগে থেকে পৃথিবীতে যে ধরনের উন্নত প্রাণিজগতের বিকাশ ঘটেছে, তা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

অ্যালান পেনি এই যুক্তিগুলিকে বিশেষ আমল দিতে চান না। দিন দিন যেভাবে প্রযুক্তি, গবেষণার উন্নতি ঘটছে, পেনির মতে, এই উন্নতি অব্যাহত থাকলে সব কিছুই সম্ভব। তবে ওয়ার্ড ও ব্রাউন্‌লির যুক্তিগুলিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাস্ট্রোনমার' অ্যান্ড্রু ক্যামেরন। তিনি বলেছেন এই মহাবিশ্বের সমস্ত নক্ষত্রের মধ্যে অন্তত ৩০ শতাংশ নক্ষত্রের আকার, আয়তন ও উষ্ণতা প্রদান ক্ষমতা সূর্যের সমান। তাদের নিজস্ব 'সৌরজগৎ'ও আছে। তাঁর কথায়, "আমরা যদি এমন কোনও গ্রহের সন্ধান পেতে পারি, যে ২০০ মিলিয়ন বছরে অন্তত এক কিমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গ্রহাণুর আঘাত এড়িয়ে চলতে পারে, তা হলেই সেখানে উন্নত প্রাণীর দেখা পাওয়া সম্ভব।" কিন্তু ঘটনা হল, এতদিনেও তার দেখা বা খোঁজ মেলেনি।

শুধু পালটা যুক্তি দিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হননি। ড্রেক নেভাডা পর্বতে একহাজার স্যাটেলাইট ডিশ একসঙ্গে জুড়ে এক দৈত্যাকার টেলিস্কোপ বসাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আরও এক বিজ্ঞানী এইরকমই অজস্র স্যাটেলাইট ডিশের সঙ্গে ইন্টারনেটের সংযোগ ঘটিয়ে 'পৃথিবীর মতো' গ্রহগুলির ওপর ২৪ ঘণ্টা নজর রাখছেন।

এঁদের এই প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিয়ে ক্যামেরন বলেছেন, খুব কাছে উন্নত প্রাণীদের বাসস্থান হয়তো পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হতাশ হলে চলবে না। ক্যামেরন আরও বলেছেন যে, পরবর্তী ১৫ বছরের মধ্যেই জানা যাবে, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও প্রাণ আছে কি না। কিন্তু উন্নত প্রাণী? ক্যামেরন শুধু আশা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু ওয়ার্ড ও ব্রাউন্‌লি জানিয়ে দিয়েছেন, পরবর্তী ১০ হাজার আলোকবর্ষের মধ্যে উন্নত প্রাণীর অস্তিত্ব নেই।

সংবাদসূত্র : দ্য সানডে টাইমস, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০০

ওয়ার্ড ও ব্রাউন্‌লি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, তিন বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে যে ধরনের নিম্নমানের প্রণীর অস্তিত্ব ছিল তা অন্য কোথাও থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ৬০০ মিলয়ন বছর আগে থেকে পৃথিবীতে যে ধরনের উন্নত প্রাণিজগতের বিকাশ ঘটেছে, তা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

মানুষখেকো নাবিক

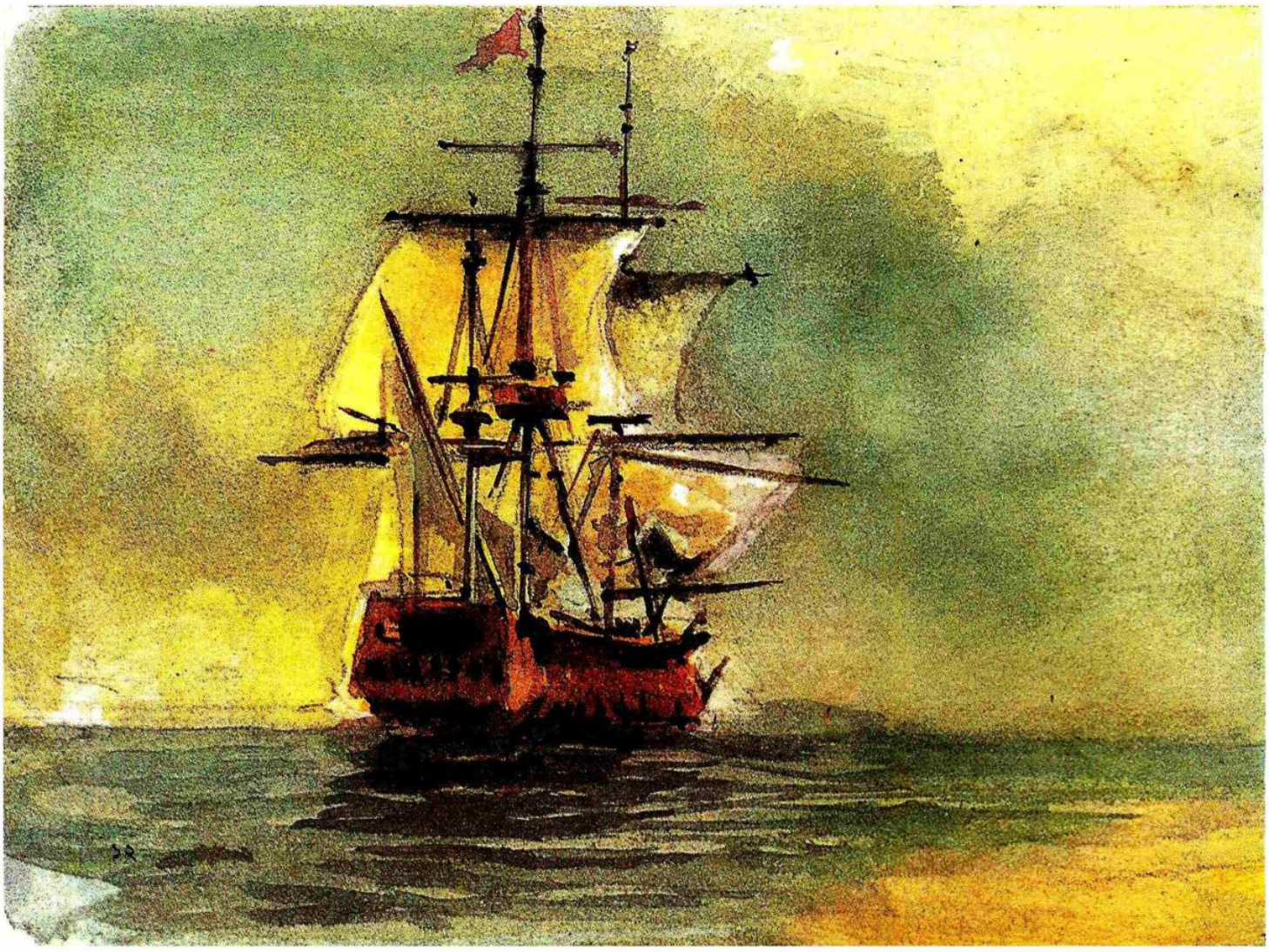

তারিখ ১৭১০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। ক্যাপ্টেন জন ডিন ১৩ জন নাবিক নিয়ে ১২০ টন ওজনের ১০টি কামানবাহী এক মাঝারি আকারের জাহাজ নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বস্টনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। জাহাজের নাম ছিল 'নটিংহাম'। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য সমুদ্রযাত্রা ছিল যথেষ্ট ক্লেশকর। মাস দুয়েক পরে ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে পোর্টস্মাউথের কাছে পিসকাটাকুয়া নদীর মোহনার উলটোদিকে (৪৩° - ০৫° উত্তর এবং ৭০° - ৪৫° পশ্চিম) কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে একটা আবছা ভূমিখণ্ড দেখা যায়। ক্যাপ্টেন ডিন যদিও খুবই সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছিলেন, কিন্তু ডিসেম্বরের ১১ তারিখ রাত প্রায় ন'টা নাগাদ ভাসমান বরফ এবং শিলাবৃষ্টির দৃষ্টিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে চলতে গিয়ে নাবিকেরা সহসা আতঙ্কিত হয়ে দেখেন যে, জাহাজ সোজাসুজি এক বড়সড় বরফের চাঁইয়ের মুখোমুখি। (এখানে টাইটানিকের ঘটনা মনে পড়ে যায়) কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুহূর্তে জাহাজের হাল ঘুরিয়েও দুর্ঘটনা এড়ানো গেল না। এক অজানা পাথরে প্রচণ্ড গতিতে আছাড় খেয়ে জাহাজ থেকে কাঠের টুকরো খসে খসে পড়তে

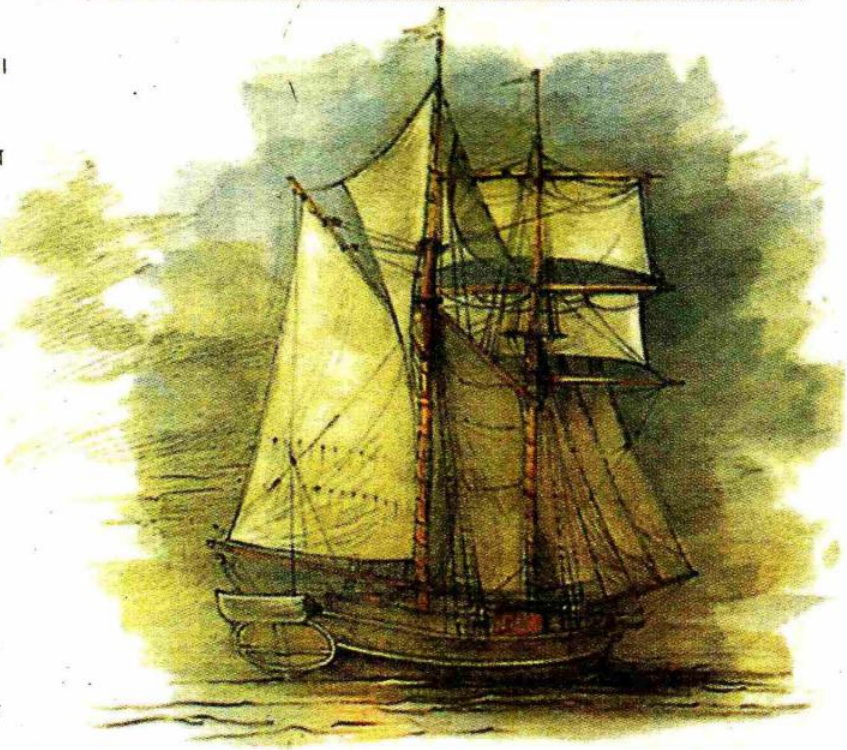

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

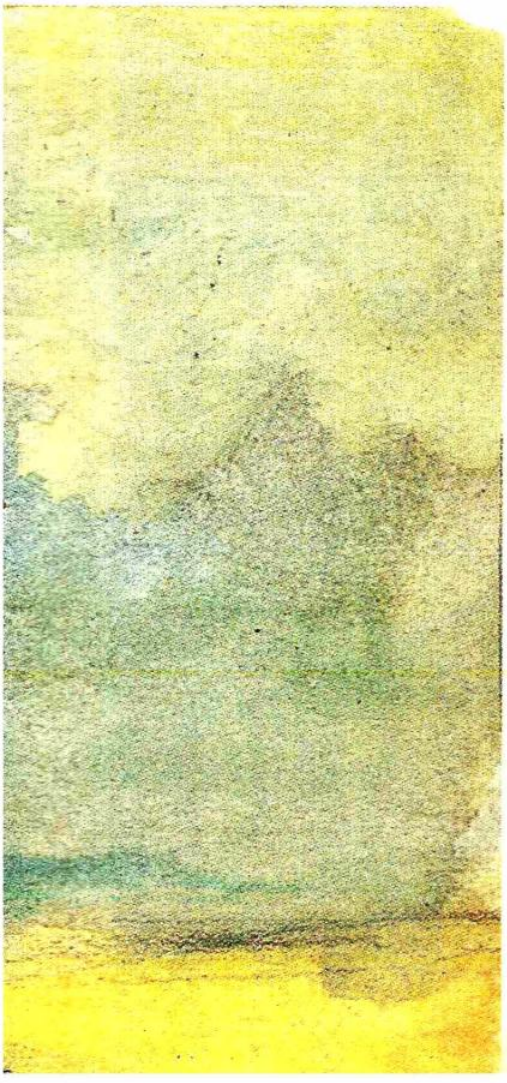

লাগল। ঘুটঘুটে অন্ধকার এবং ঝঞ্ঝায় বোঝা যাচ্ছিল না যে, ভূখণ্ড কাছাকাছি, না বহু দূরে। এই পরিস্থিতিতে কেউ পালিয়ে গিয়ে যে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেবে, তারও উপায় নেই। মৃত্যুভয়ে এক জায়গায় হাঁটু গেড়ে জড়সড় হয়ে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনও পথ ছিল না কারও। কিন্তু ক্যাপ্টেনের বাস্তব বুদ্ধি প্রখর। তিনি কালবিলম্ব না করে যতক্ষণ না ঝড়ের ঝাপটা জাহাজের ওপর থেকে কমানো যায়, আর নাবিকরা কাছাকাছি কোনও উপকূলে পৌঁছবার সময় পান, ততক্ষণ জাহাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য পাল সহ জাহাজের মাস্তুলটি কেটে দিতে আদেশ দিলেন। যেহেতু হাওয়া সমুদ্রের দিক থেকে ডাঙার দিকে বইছিল, মাস্তুল ছিন্ন করে দেওয়ার পর সেটি হাওয়ার ধাক্কায় ডাঙার দিকে মুখ করে ঝুলে রইল। একজন নাবিক ভাঙা মাস্তুল বেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতেই প্রায় ৩০-৪০ গজ দূরে বেশ কয়েকটা বড় বড় পাথরের স্তূপ দেখতে পেলেন। তিনি চিৎকার করে জানালেন, কেউ যদি তাঁর সঙ্গে আসেন তা হলে তিনি ওই পাথরগুলোতে পৌঁছবার চেষ্টা করতে পারেন। ক্যাপ্টেন ডিন দলের মধ্যে একজন দক্ষ সাঁতারুকে সঙ্গে যেতে বললেন। তিনি নির্দেশ দিলেন পাথরের স্তূপগুলোর একটাতে পৌঁছতে পারলে চিৎকার করে যেন জানিয়ে দেন।

ওঁরা চলে যাওয়ার পর অনেক সময় কেটে গেল, কিন্তু কোনও আওয়াজ শোনা গেল না। আশঙ্কা হল, ওঁরা জলে ডুবেই মারা গেছেন। এদিকে কিছু মূল্যবান কাগজপত্রের কথা মনে হতে সেগুলো উদ্ধারের জন্য আর সেইসঙ্গে যদি সম্ভব হয় তবে এক বোতল ব্র্যান্ডি, কিছু গোলাবারুদ এবং টাকার ব্যাগ আনার জন্য ক্যাপ্টেন তাঁর কেবিনে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেবিন আগেই জলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে, সেজন্য এই

সত্যিই কি মানুষ খেয়েছিল জাহাজের ওই নাবিকরা? প্রায় ৩০০ বছর আগের সমুদ্রে অ্যাডভেঞ্চারের এক রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনা। লিখেছেন প্রবীরকুমার মৈত্র।

পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হল। এর পর আর দেরি না করে ক্যাপ্টেন মনস্থির করে ফেললেন, হয় পাথরের স্তূপগুলোর কাছে পৌঁছনো, না হয় এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই মৃত্যুবরণ করা। পাথরের কাছে পৌঁছনোই শ্রেয় মনে করে ক্যাপ্টেন সেই রাতের বরফে ছাওয়া জলে ঝাঁপ দিলেন।

জমাট অন্ধকারে আঁকাবাঁকা পাথরের খাঁজে ঠোকাঠুকি খেতে খেতে শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করে কোনওরকমে একটা বড়সড় পাথরে উঠতেই ক্যাপ্টেন পাশ থেকে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ভাঙা ও কর্কশ গলার ফ্যাঁসফ্যাঁসে আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন আগের দু'জন নাবিক বোধ হয় এখনও বেঁচে আছেন। এর পর ক্যাপ্টেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন এবং একই কষ্টকর উপায়ে সকলেই একে-একে ওই স্যাঁতসেঁতে শেওলার পিছল পাথরে ওঠার পর ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার ভয়ে জড়াজড়ি করে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন ভোরের আলো ফুটে ওঠার অপেক্ষায়। আগে মনে করা হয়েছিল ওখানে সমুদ্র থেকে মাথা-উঁচু করা শুধু বড় বড় পাথর ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু ভোরের আলো ফুটতেই বোঝা গেল যে,ওই জায়গাটা একটা ছোটখাটো দ্বীপ।

আজ পর্যন্ত যত ডোবা জাহাজের নাবিকদের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী জানা যায় ; তা সে প্রথম অরণ্যদেবের আবির্ভাবই হোক, জুলে ভার্নের 'মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড' অথবা রবিনসন ক্রুশোই হোক, সমস্ত গল্পের শুরু কিন্তু নির্জন দ্বীপের শুকনো বালুময় সমুদ্রসৈকতে, যেখানে ছায়াঘেরা গাছ আছে, আছে খেয়ে বেঁচে থাকবার মতো শাকসবজি ও ফল। কিন্তু এখনকার এই সত্যকাহিনীর ঘটনা যেখানে ঘটতে চলেছে, সেই দ্বীপে কোনও বালির সৈকত তো নেইই, উপরন্তু না আছে কোনও গাছপালা আর না আছে খেয়ে বেঁচে থাকার মতো ফলমূল, প্রাণী বা ওই জাতীয় কিছু। আছে শুধু রাশি রাশি পাথর, যার ফাঁকে ফাঁকে অবিরত বয়ে চলেছে গা-জমানো হিমেল হাওয়ার ঝড়।

যে দ্বীপে এই ১৪ জন নাবিক আশ্রয় নিয়েছেন, তার ভৌগোলিক নাম 'বুন আইল্যান্ড'।

পোর্টস্‌মাউথের কাছে পিসকাটাকুয়া নদীর মোহনার ঠিক উলটোদিকে মাত্র ২১ মাইল দূরে এই বুনদ্বীপ। এখানকার সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরিখে মূল ভূখণ্ড থেকে ২১ মাইলের দূরের কোনও দ্বীপে নির্বাসনের ব্যাপারটা তেমন কোনও গুরুত্ব হয়তো নাও পেতে পারে, কিন্তু এখন থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে, বুন আইল্যান্ড এখনকার উত্তর গ্রিনল্যান্ডের সভ্যতার আলো থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

যাই হোক,নাবিকরা দিনের আলোতে দেখতে পেলেন, আশপাশে ইতস্তত ভাঙা কাঠের টুকরো, ছেঁড়া দড়ি, তক্তা ইত্যাদি ভাসছে। কিন্তু অনেক খুঁজেও এমন কোনও বাক্স পাওয়া গেল না যার মধ্যে খাবারদাবার ইত্যাদি মজুত আছে, যেমন পাওয়া গিয়েছিল রবিনসন ক্রুশো বা মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড গল্পে।

পাথরে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে নাবিকরা, সমুদ্রের কানায় জলে ধোয়া সামান্য পনির যা কুড়িয়ে পেলেন, সেটাই ছিল তাঁদের সেদিনকার মতো খাবার। সূর্য অস্ত

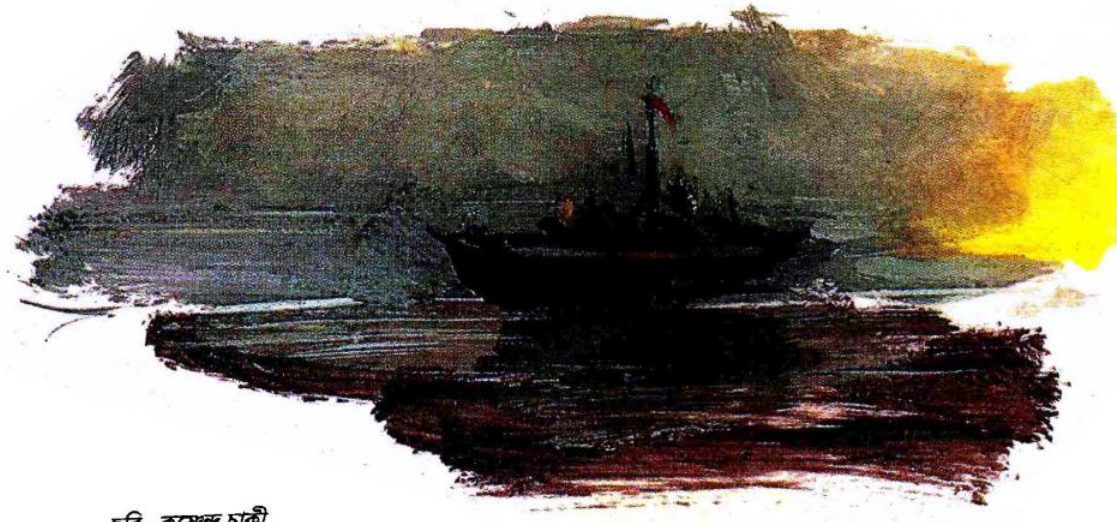

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

যাওয়ার আগে আর-একটা কাজ বাকি, অর্থাৎ থাকার ব্যবস্থা। কিছু ছেঁড়া ক্যানভাস ও কাঠের টুকরো যা পাওয়া গেল, তা দিয়ে মোটামুটি একটা সমতল জায়গায় একটা ছোট আচ্ছাদন করা হল, যার ভেতর ঢুকতে গেলে হামাগুড়ি দিতে হত। সেখানে সবাই জড়াজড়ি করে শুয়ে দ্বিতীয় বিভীষিকাময় রাতটি কাটালেন।

এর মধ্যে ইস্পাত ও চকমকি পাথরে ঘষে কম্বলের ওপর আগুন ধরাবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু ভেজা কম্বলে আগুন ধরল না। একই চেষ্টা ৮-১০ দিন ধরে করলেন। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

দ্বিতীয় দিনে আবহাওয়া একটু পরিষ্কার হল। পশ্চিম দিগন্তে মূল ভূখণ্ডের কিছুটা আবছাভাবে দেখা গেল। নাবিকরা একটা নৌকো বানিয়ে ওখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন। ক্যাপ্টেন ডিন সক্ষম নাবিকদের নির্দেশ দিলেন, পাথরের খাঁজে খাঁজে নৌকো তৈরির উপযোগী কোনও কিছু পাওয়া যায় কি না খুঁজে

দেখতে। কিন্তু কয়েকজন নাবিক খিদে ও ঠাণ্ডায় এতই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা কোনও কাজেই লাগলেন না। এর মধ্যে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল, অসুস্থদের মধ্যে দলের পাচক মারা গেলেন। তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রের ধারে রেখে দেওয়া হল, যাতে ঢেউয়ে ভেসে যেতে পারে। এর পর যখন সকলের খিদে একটু কমে এল, তখন সকলে মুখ খুললেন, আর অকপটে স্বীকার করলেন যে, খিদের জ্বালায় পাচকের মৃতদেহটির প্রতি তাঁদের খুবই লোভ হচ্ছিল। কিন্তু লজ্জায় তা বলতে পারছিলেন না।

এই দ্বীপের তৃতীয় দিনে আবহাওয়ার ভয়াবহতা আরও বেড়ে গেল এবং সকলেরই হাত-পা শৈত্য-অসাড়তার (ফর্স্টবাইট) আক্রমণে সাদা হয়ে গেল। কারও কারও আবার জুতো, মোজা টেনে খোলার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের চামড়া, গোড়ালির মাংস এবং আঙুলের নখ খুলে আসতে লাগল। তাই পা আরও পচে যাওয়ার ভয়ে সেগুলো যাতে একটু গরম থাকে সেজন্য মোটা কাপড় ও ছোবড়া দিয়ে মুড়ে রাখা হল।

ইতিমধ্যে দেখা গেল ফুট আটেকের মতো লম্বা একটা পাল সমুদ্রে ভেসে এসে পাথরে আটকে রয়েছে। সেটা দিয়ে মোচার মতো দেখতে একটা তাঁবু বানানো হল এবং আগের ছাউনিটা ছেড়ে দিয়ে হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবাই এর মধ্যে চলে এলেন। এটাতেও হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হত এবং জায়গা একদম না থাকায় কোনওরকমে গাদাগাদি করে শোয়া হত আর সবাই কাত হয়ে না শুলে কেউ একজন পাশ ফিরতে পারতেন না।

অন্যদিকে যখন দেখা গেল, চলতি মাপের প্রমাণ সাইজের নৌকো তৈরি প্রায় অসম্ভব, তখন বাক্সের আকারে একটা ছোট ডিঙি তৈরি করা যায় কি না তার চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু আদ্যিকালের যন্ত্রপাতি ও অপর্যাপ্ত জিনিসপত্র দিয়ে ডিঙি তৈরিও কঠিন মনে হল। কারণ যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল একটা ভাঙা ছুরি দিয়ে তৈরি করাত, একটা কাঠের হাতুড়ি এবং পাথরের খাঁজ থেকে কুড়িয়ে আনা কিছু পেরেক। কিছু তক্তাও জোগাড় হয়েছিল অবশ্য। সেগুলো একসঙ্গে জড়ো করে পুরনো দড়ির আঁশ দিয়ে বেঁধে ফেলা হল। বড় বড় ফাঁকগুলো ভাঙা জাহাজ থেকে ছিটকে আসা সিসার পাত দিয়ে জুড়ে দেওয়া হল। এই সংকীর্ণ বাক্সটির মধ্যে একটা ছোট মাস্তুল বসিয়ে তাতে একটা চৌকো পালও খাটিয়ে দেওয়া হল। কোনওরকমে সাতখানা বৈঠা তৈরি হল, যার মধ্যে বড়টি হালের কাজের জন্য রাখা হল। এই সমস্ত কাজ চলার সময় যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি ছিল তিনি দলের কাঠের মিস্ত্রি। কিন্তু তিনি ভয়ানক অসুস্থ থাকায় পুরো কাজের দায়িত্ব পড়ল শক্তসমর্থ তিনজন নাবিকের ওপর। আর বাদবাকিরা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে তাঁবুর ভেতর অবিন্যস্তভাবে অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে রইলেন। এর মধ্যে আবার হিমেল হাওয়ার সঙ্গে বরফের ঝাপটার দাপট বেড়ে গেল। মৃতপ্রায় মানুষগুলোর ওই ছোট্ট তাঁবুটায় দিনের পর দিন আটকে থাকতে থাকতে দমবন্ধ অবস্থা। আয়ু বোধ হয় শেষ হয়ে এল!

সপ্তাহখানেক পুরনো হাড় চিবিয়ে আর কয়েক টুকরো পনির খেয়ে কাটাতে হল সকলকে। পরে একদিন প্রায় ১৫ মাইল দূরে তিনখানা নৌকো দেখতে

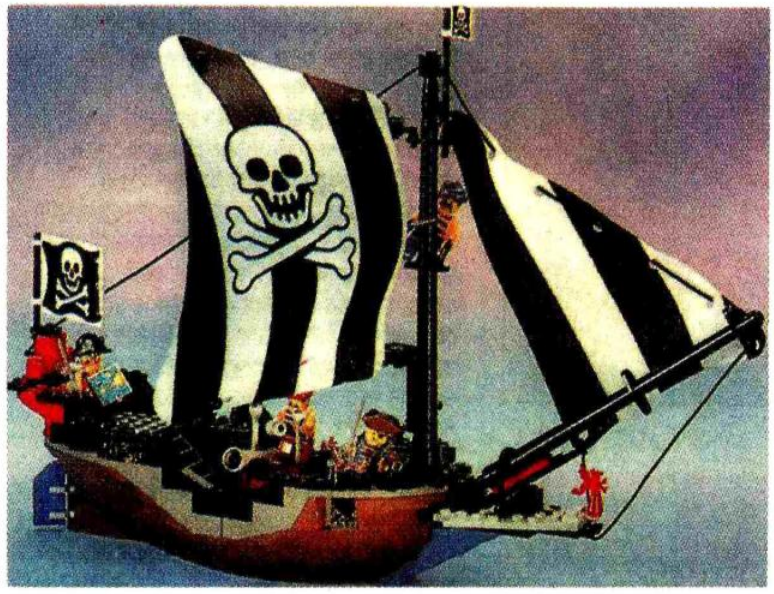

পেয়ে সকলেই প্রায় শিশুর মতো আনন্দ করতে লাগলেন। ক্যাপ্টেন সকলকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে নৌকোর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে বললে কী হবে, এই দুর্বল মানুষদের সম্মিলিত চিৎকার দূরের অরণ্য থেকে ভেসে আসা নেকড়ের কান্নার আওয়াজের চেয়ে কোনওমতেই বেশি মনে হল না। অচিরেই নৌকোগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল আর হতাশ নাবিকরা নিরাশায় নিস্তেজ হয়ে পড়লেন।

যে ডিঙিটা তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়েছিল তাতে আবার হাত লাগানো হল। এর মধ্যে আবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ডিঙি তৈরি শেষ হওয়ার আগেই ডোবা জাহাজ থেকে একদিন কাঠমিস্ত্রির কুড়ুলটা ভেসে চলে এল দ্বীপে। এতে যে শুধু কাজেরই সুবিধে হল তা নয়, সকলেই ভাবলেন, এটা ঈশ্বরের করুণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে সকলের বাঁচার আস্থা বেড়ে গেল। অবশেষে ডিসেম্বরের ২১ তারিখে অর্থাৎ জাহাজডুবির ১০ দিন পরে অনেক কষ্টে সেই নড়বড়ে ডিঙিটাকে জলে ভাসানো হল। শান্ত সমুদ্র ও পরিষ্কার আকাশ দেখে ক্যাপ্টেন ঠিক করলেন তিনি নিজে এবং সঙ্গে তাঁর 'মেট' ছাড়া কয়েকজন বলিষ্ঠ নাবিককে নিয়ে যাত্রা শুরু করবেন। কিন্তু ডিঙিটাকে জলে ভাসাতে-না-ভাসাতেই এক বিরাট ঢেউ এসে ডিঙিটাকে এমনভাবে পারে ছুড়ে ফেলল যে, তা ভেঙে টুকরো টুকরো তো হলই, আরোহীদেরও সলিল সমাধির উপক্রম হল। এর ওপর অন্য বিপত্তি। সেই কুড়ুল এবং হাতুড়িটা এই ফাঁকে জলে হারিয়ে গেল। এই দুর্ঘটনায় মূল ভূখণ্ডে যাওয়ার ক্ষীণ আশাটুকুও অস্তমিত হল। এদিকে ক্যাপ্টেন ছাড়া অন্য সকলের হাত ও পায়ে শৈত্য-অসাড়তার ফলে এমন পচন শুরু হল যে, দৈবক্রমে বেঁচে থাকলেও অঙ্গহানি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। অবস্থার এত অবনতি হত না, যদি অন্তত আগুন জ্বালানো যেত আর ঠিকমতো খাদ্য পাওয়া যেত। খাবারের মধ্যে ছিল পাথরের গায়ে গজানো আগাছা আর কাঁচা ঝিনুক। তাও আবার রোজ জুটত না। যেভাবে উপবাসে কাটাতে হচ্ছিল তাতে প্রতি মুহূর্তে

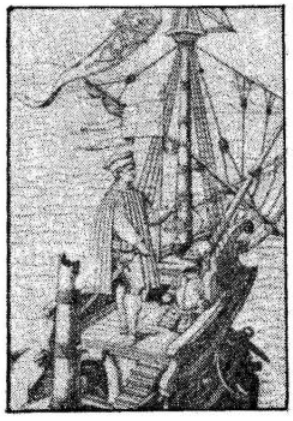

মনে হচ্ছিল মৃত্যু যেন শিয়রে। যদিও-বা এ-যাত্রায় টিকে যায়, আসন্ন বসন্তের জোয়ার যখন সম্পূর্ণ দ্বীপটিকে ডুবিয়ে দেবে, তখন কারও সাধ্য নেই এঁদের বাঁচায়।

এর মধ্যে ক্যাপ্টেনের মেট পাথর ছুড়ে একটা গাঙচিল মেরে আনলেন। তার কাঁচা মাংস খেয়ে সকলে যেন একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। শৈত্য-অসাড়তার ফলে নাবিকদের মধ্যে একজন, যাঁর দুটো পা অকেজো হয়ে গেছে, তিনি করুণভাবে এক প্রস্তাব রাখলেন সকলের কাছে। বললেন, "আমি তো তোমাদের কোনও কাজেই লাগব না। এখন একটা ভেলা বানিয়ে তাতে আমাকে যদি ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে আমি অন্তত মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে তোমাদের উদ্ধারের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারি। আমার সঙ্গে তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজন আসতেও পারো।"

এঁরা যখন এইসব আলোচনা করছিলেন, তখন দূরে নদীর মোহনার কাছে একটা নৌকো দেখা যাচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখার পর সেই অথর্ব নাবিক আর একদণ্ড এই জঘন্য দ্বীপে থাকতে চাইলেন না। কিন্তু সমুদ্র হঠাৎ অশান্ত হয়ে ওঠায় যাত্রা সেদিনের মতো বাতিল করা হল। পরের দিন ওই একই কারণে দ্বীপ ছেড়ে যাওয়া হল না। তার পরের দিন ভেলার কিছু বাকি কাজ সারতে সারতে বেলা গড়িয়ে গেল। আঁধার ঘনিয়ে আসছে। অন্ধকারে পথ দেখার অসুবিধের কথা মাথায় রেখে ক্যাপ্টেন যাত্রা স্থগিত রাখতে বললেন সেদিনও। কিন্তু সেই নাবিক ও তাঁর সঙ্গী নাছোড়বান্দা। তাঁরা যাবেনই। এবং এখনই। তাঁদের এই কাতর অনুরোধে থাকতে না পেরে ক্যাপ্টেন শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন। ক্যাপ্টেন বুঝতে পারছিলেন যে, এই অসুস্থ অথচ অদম্য নাবিককে এইভাবে যেতে দিলে তা হবে আত্মহত্যার শামিল। কিন্তু নাবিকটি দমবার পাত্র নন। তিনি বারবার অনুরোধ করছিলেন তাঁকে যেতে দিতে হবে, কারণ এই দ্বীপে পড়ে থেকে নিশ্চিত মৃত্যুর চেয়ে দূরে গিয়ে মরা ভাল। ভাগ্য প্রসন্ন হলে হয়তো বেঁচেও যেতে পারেন। এই আলোচনা শুনে অন্য এক নাবিক তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেলেন। এতে উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। নতুন নাবিক নিয়ে তিনি আবার হামাগুড়ি দিয়ে ভেলায় উঠে বসলেন। সৌভাগ্যক্রমে পাথরের ধাক্কা বাঁচিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল ভেলাটি এবং সূর্যাস্তের আগে অবধি এঁদের দ্বীপ ও মূল ভূখণ্ডের মাঝামাঝি কোনও এক জায়গায় ছোট্ট এক বিন্দুর মতো দেখাতে লাগল। যদি ভাগ্য প্রসন্ন থাকে তা হলে পরের দিন ভোর দুটো নাগাদ মূল ভূখণ্ডে পৌঁছতে পারবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই যাত্রা সৌভাগ্যময় ছিল না। ভবিষ্যতে এঁদের দু'জনার কাউকে আর জীবিত দেখা যায়নি। যদিও দ্বিতীয় নতুন সহযাত্রীর মৃতদেহ তাঁর হাতের সঙ্গে বৈঠা বাঁধা অবস্থায় মূল ভূখণ্ডের উপকূলে পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃসাহসী আর জেদি সেই নাবিকের দেহ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর ভেলাটি এসে ঠেকে ছিল নতুন যাত্রীর মৃতদেহ থেকে মাইলখানেক দূরে পিসকাটকুয়া নদীর কাছে।

এদিকে দ্বীপের নাবিকরা চারদিন ধরে আশায় রইলেন। কিন্তু কোনও সাহায্য না আসায় হাল ছেড়ে দিতে হল। এর মধ্যে একদিন মূল ভূখণ্ডের বনাঞ্চল থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখে ওটাকে কোনও সঙ্কেত বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে এ-ব্যাপারে কোনও অগ্রগতি না হওয়ায় সকলে আরও নিরাশ হয়ে উঠলেন। দিনের পর দিন অভুক্ত থাকতে থাকতে শারীরিক বল এত কমে গিয়েছিল যে, ওঁরা সকলে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। প্রতিদিন পাথরের আগাছা আর ঝিনুক খেয়ে পেট ভরাতে হচ্ছিল। তা ছাড়া প্রতিদিন এগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে ঘনঘন কনকনে জলে হাত ডোবাতে হচ্ছিল। এর ফলে ক্যাপ্টেনের হাতের দশাও ভয়ানক হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের আশপাশে সিলমাছ আর গাঙচিল দেখতে পাওয়া গেলেও তাদের নাগাল পাওয়া কঠিন। শুধু একটা জিনিসই পর্যাপ্ত ছিল, তা হল বৃষ্টি আর বরফগলা জল—যা একটা ভাঙা পাউডারের কৌটো দিয়ে তুলে তুলে খেতে হত সকলকে।

একদিন কোথা থেকে যেন একটুকরো চামড়া ভেসে এল। তাই সকলে খেয়ে ফেলল ছোট ছোট টুকরো করে কেটে। এদিকে আগাছা খেতে খেতে এমন পেটের অসুখ হল যে, সকলে চলনশক্তিরহিত হয়ে পড়ে রইলেন তাঁবুর ভেতর। এদিকে তাঁবু ভিজে টইটম্বুর। দলের মধ্যে শক্তসমর্থ মানুষটিও ক্রমশ উত্থানশক্তি হারিয়ে ফেলছেন। দুর্দশার আর অন্ত নেই। কতদিন আর এভাবে থাকা যায়! অবশেষে একদিন রাতে দীর্ঘদিনের রোগভোগের পর দলের কাঠের মিস্ত্রি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। সাতচল্লিশ বছর বয়সী এই নাবিকটির ঠাণ্ডায় ঘাড় শক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং পিঠে অসহ্য ব্যথায় ভুগছিলেন বহু দিন ধরে। সকলে অসহায়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। বাইরে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ আর সকলের শারীরিক অবনতির ফলে ওই মৃতদেহ জড়িয়ে ধরেই সারারাত তাঁবুর ভেতর কাটিয়ে দিলেন সকলে। পরদিন সকালে প্রতিদিনের মতো আগাছা সংগ্রহের কাজে বেরোবার আগে ক্যাপ্টেন কাঠমিস্ত্রির মৃতদেহটি বাইরে বার করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেলেন দুই সক্ষম নাবিককে। বহুক্ষণ ধরে খাবার খোঁজাখুঁজি করে যখন কিছুই মিলল না তখন ভগ্নহৃদয়ে ক্যাপ্টেন তাঁবুতে ফিরে এসে দেখেন মৃতদেহটি তাঁবুর ভেতর যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ওটা কেন বার করা হল না জানতে চাওয়ায় সকলে ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন ক্যাপ্টেন নিজেই একটা দড়ি জোগাড় করে বেঁধে মৃতদেহটাকে তাঁবু থেকে একটু দূরে এনে রাখলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিশ্রমে কোনওরকমে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুতে ঢুকে অচেতনের মতো পড়ে রইলেন। ক্লান্ত ক্যাপ্টেনের এই মর্মান্তিক অবস্থা দেখে সকলে তাঁকেই কাঠমিস্ত্রির মৃতদেহের অংশবিশেষ খাওয়ার জন্য পরামর্শ এবং অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুনয়বিনয় করতে লাগলেন।

তিন সপ্তাহ আগে সকলে যখন একসঙ্গে রওনা দেন, তখন তাঁরা নরমাংস খাওয়ার কথা ভাবতেও পারেননি, তাও আবার এতদিনের সহযাত্রীর দেহ থেকে। কিন্তু এই তিন সপ্তাহে সকলের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বেদনাদায়ক হলেও এইরকম প্রস্তাব রাখা ছাড়া আর কোনও পথই খোলা ছিল না উদরপূর্তির তাগিদে। এই

প্রস্তাবে ক্যাপ্টেন মানসিক আঘাত পেলেন। কাজটা অমানবিক, কিন্তু উপায় কী! কিন্তু তাঁরও তো পেট বাধা মানছে না। এদিকে অন্য নাবিকদের ক্রমাগত চাপ। অগত্যা অনুমতি দিয়েই দিলেন।

ক্যাপ্টেন সম্মতি দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল সকলে বন্য হিংস্র জন্তুর মতো সেই মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ওই মৃতদেহ ভক্ষণ করার আগে ক্যাপ্টেন হাত, পা, মাথা এবং অন্ত্র সমুদ্রে ফেলে দিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু এই কাজটুকু করার মতো শক্তি কারও ছিল না। সকলের অনুরোধে ক্যাপ্টেনকেই এই বেদনাদায়ক কাজটা করতে হল।

অবশেষে জানুয়ারি মাসের ২ তারিখ সকালে ক্যাপ্টেন যখন পাথরের খাঁজে লুকিয়ে রাখা মাংস আনার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর বাইরে এলেন, তখন অবাক হয়ে দেখলেন যে, সমুদ্রপারের পাথরগুলো থেকে আরও প্রায় ১০০ গজ দূরে একটি শ্যালন (অধুনাবিলুপ্ত ছোট জলযান) নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে। জোয়ারের ঢেউয়ে পাথরে ধাক্কা খাওয়ার ভয়ে সারাটা সকাল ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল ওই শ্যালনটি। এই শ্যালনটি অবশ্য কাকতালীয়ভাবে এসে পড়েনি। ভাঙা ভেলা ও সেই দ্বিতীয় নাবিকটির মৃতদেহ দেখে মূল ভূখণ্ডের মানুষদের সন্দেহ হয়। তখন তাঁরা বিষয়টির অনুসন্ধান করতে এই শ্যালনটি নিয়ে বুন দ্বীপের উপকূলের অদূরে নোঙর করেন। অর্থাৎ সেই দুটি অথর্ব মানুষ যাঁরা অন্ধকার আসন্ন জেনেও ভেলা নিয়ে মূল ভূখণ্ডের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন তাঁদের আত্মত্যাগ বিফলে যায়নি।

ক্যাপ্টেন তখন তীরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে তাঁদের বিপর্যয়ের কাহিনী শোনালেন। পাছে কোনও সাহায্য দিতে দ্বিধা করেন তাই অভুক্ত থাকার কথা ইচ্ছে করেই চেপে গেলেন। কিন্তু এই ভয়ানক দ্বীপে নামবার পর আবার যদি আটকে পড়েন এই ভয়ে কেউ শ্যালন থেকে নামতে চাইলেন না। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর নিদেনপক্ষে একটু আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল। তখন একজন শ্যালন থেকে একটা ছোট্ট নৌকো নিয়ে রওনা দিলেন। ঢেউ ও পাথরের ধাক্কায় জীবন বিপন্ন করে সেই মানুষটি যখন পারে পৌঁছলেন তখন তিনি রীতিমত বিধ্বস্ত। আগুন জ্বালানো হলে সকলে জড়ো হয়ে তাপ নেওয়ার পর একটু চাঙ্গা হলেন। বিকেলের দিকে ক্যাপ্টেন সেই লোকটির সঙ্গে ছোট নৌকোটিতে করে শ্যালনে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দু'জনেই নৌকো থেকে উলটে গিয়ে জলে পড়ে গেলেন। অসুস্থ শরীরে সমুদ্রের ঢেউয়ের মোকাবিলা করতে না পেরে পারে উঠে মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। আর শ্যালনের লোকটি আবার পরে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দ্বিতীয়বারের প্রচেষ্টায় ফিরে গেলেন একাই। কিন্তু সে রাত্রে আবহাওয়ার অবনতি হওয়ার ফলে ঝড়ের তাণ্ডবে সেই শ্যালনটি মূল ভূখণ্ডের দিকে হারিয়ে গেল। পরে এর নাবিকরা কোনওরকমে সাঁতরে তীরে উঠে পোর্টস্‌মাউথে (নিউহ্যাম্পশায়ারে) গিয়ে বুন দ্বীপে নির্বাসিত মানুষদের খবর জানিয়ে দিলেন।

এদিকে আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্য বুন দ্বীপে আটকে থাকার আশঙ্কায় মাংসের রেশন করা হল। এতে অসন্তুষ্ট নাবিকরা মাংস চুরি করার ষড়যন্ত্র করলেন এবং ক্যাপ্টেনের হাতে ধরা পড়ে তিরস্কৃতও হতে হল। এত নাটকের পরেও সকলকে কাঠমিস্ত্রির দেহের অবশিষ্ট মাংস খেয়ে কাটাতে হল পরবর্তী কয়েকদিন। দু'দিন পর ঝড় শেষ হলে তৃতীয় দিন ভোরে বন্দুকের আওয়াজ শুনে সকলেই তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন। ভোরের আবছা আলোতে দেখতে পেলেন দূরে নোঙর করা একটা বড় মাপের শ্যালনে পাঁচজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। সময় নষ্ট না করে তাঁরা তৎক্ষণাৎ একটা বড় মাপের নৌকো ভাসিয়ে দিলেন জলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুন দ্বীপে নির্বাসিত দুর্গত ও মুমূর্ষু মানুষদের সকলকেই উদ্ধার করে শ্যালনে তুলে নেওয়া হল। রওনা হলেন মূল ভূখণ্ডের দিকে। এইভাবে অবসান হল ডোবা জাহাজের ১৪ জন নাবিকের বেঁচে থাকার সংগ্রামের একটি বিভীষিকাময় অধ্যায়।

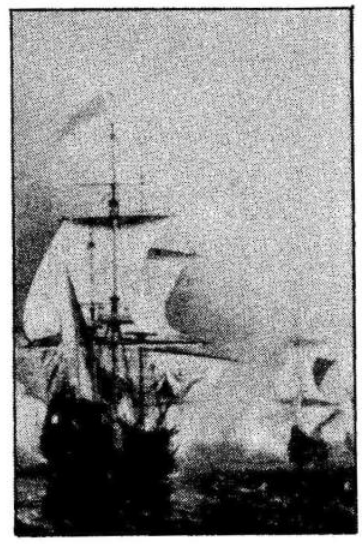

[বিশ্বসেরা কিশোর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীগুলির মধ্যে রবিনসন ক্রুশোর কাহিনী শুধু প্রাচীনই নয়, ছোটদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়ও বটে। কয়েক শতাব্দী ধরে শিশু ও কিশোরদের স্কুলপাঠ্য বইগুলিতে রবিনসন ক্রুশোর সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার আশ্চর্য বৃত্তান্ত জায়গা করে নিয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের এই যে, বেশিরভাগ বইয়ে এই কাহিনী খুব সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া আছে। তবুও এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা এতটুকুও কমেনি।

এই কাহিনীর লেখক যেন রবিনসন ক্রুশো নিজেই; এইভাবে ১৭১৯ সালের ২৫ এপ্রিল বইটি প্রকাশিত হয় ইংল্যান্ডে। এবং এর পর থেকে ক্রুশোর অভিযান ও অ্যাডভেঞ্চারের খুঁটিনাটি সহ বিস্তৃত বিবরণ আজও সারা বিশ্বে সমানভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়ে আসছে। তা ছাড়া মানুষ এটাকে একটি সত্য ঘটনা হিসেবে বিশ্বাস করে আসছে কয়েক শতাব্দী ধরে। কিন্তু শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে, রবিনসন ক্রুশো নামে কারও অস্তিত্ব কোনওদিন ছিল না। আর এর অভিযানও সত্য ঘটনা নয়। যদি কিছু সত্য থেকে থাকে, তা হল, রবিনসন ক্রুশোর কাহিনী প্রকাশিত হওয়ার অন্তত সাত বছর আগে (১৭১২) ক্যাপ্টেন উড্‌স রজার্স-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত রচনায় দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম সাগরে 'হুয়ান ফার্নান্ডেজ' নামে জোড়াদ্বীপে আলেকজান্ডার শেলকার্ক নামে এক নাবিক যে অ্যাডভেঞ্চার করেছিলেন, তারই অনুকরণ। এই প্রতিভাধর লেখকের নাম ডানিয়েল ডিফো। তিনি রবিনসন ক্রুশোর কল্পকাহিনী লেখার আগে নাবিক আলেকজান্ডার শেলকার্কের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে খুঁটিনাটি অনেক কিছু জেনে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া ডিফো ড্যাম্পায়ারের 'নিউ ভয়েজ রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' বইটি থেকেও প্রচুর তথ্য নিয়েছিলেন।

এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রবিনসন ক্রুশোর কাহিনী প্রকাশ হওয়ার বহু আগে এমন সব রোমহর্ষক সামুদ্রিক অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেছে, যা আজও আমাদের সমানভাবে আগ্রহ সৃষ্টি করে। তেমনই একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে এই কাহিনী।]

নতুন ঠিকানা দুয়ারসিনি

সবুজে-ঘেরা সাতগুড়ুম নদী ফোটো : শুভম বিশ্বাস

সবুজকে বাঁচিয়ে প্রকৃতিকে সাজিয়ে পশ্চিমবাংলার দলমা পাহাড়ের কাছে বনবিভাগ ও উন্নয়ন নিগমের যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠতে চলেছে দুয়ারসিনি। পাহাড়ে থাকবে ছোট ছোট তাঁবু— ভ্রমণার্থীদের জন্য। বসন্তের দুয়ারসিনি আর পাহাড়ি সাতগুড়ুম নদীর আকর্ষণের কথা জানাচ্ছেন জগন্নাথ ঘোষ

বসন্তের দুয়ারসিনি ফোটো : কমলেশ কামিলা

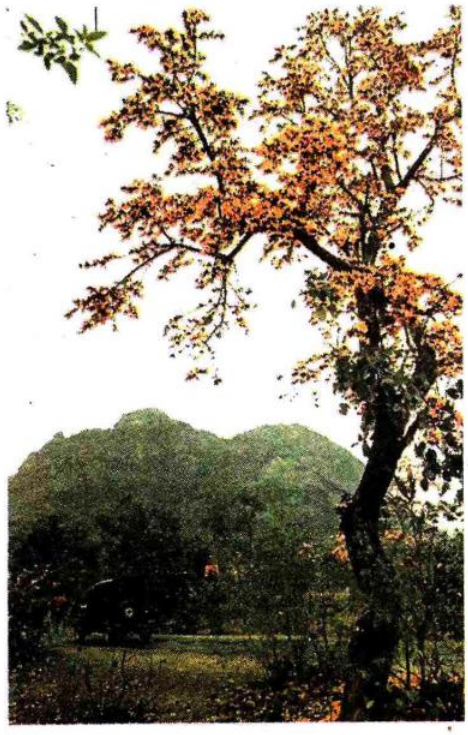

গ্রামের নাম ঘাটিউলি। বান্দোয়ান থেকে পাঁচ কিমি দূরে। ঘাটিউলি পেরিয়ে পাহাড় দেখা যায় অল্প স্বল্প। সবুজ নওল শাল, আর পুরো মাঠ লাল মোরামের। তারপর ঘন ঘন বাঁক পেরিয়ে কাঁটাপাহাড়। পিচ সড়কের মাঝে দুধারে পাহাড় ডানা মেলে দিয়েছে। বসন্তের ঘন সবুজ ডানা। দলমার এই কাঁটাপাহাড় আতঙ্কের। হাতির করিডর। তবে হাতিদের অত্যাচারে গ্রামের নিস্তার নেই। মাটির

পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী পাহাড়

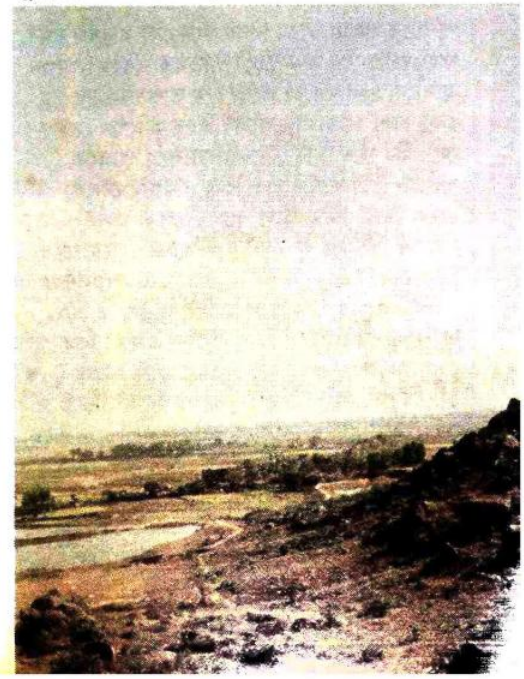

দেওয়াল, শনের চালা নিয়ে দশ-বারো ঘর মাহাত পাড়া, মুণ্ডা পাড়া। আষাঢ়-শ্রাবণের পোঁতা ধান যায় হাতির পেটে অঘ্রানে।

পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থেকে দুয়ারসিনি মাত্র ১৪ কিমি। তার পাঁচ কিমি আগেই চোখে পড়ে একটা হোর্ডিং—'ভালপাহাড়'। মানুষ আর প্রকৃতির যৌথ উদ্যোগে তৈরি। নিবিড় বনভূমি টাটার এক বৃক্ষ-বন্ধু কয়েকশো বিঘায় সবুজের স্বপ্ন পুঁতেছেন কুচিয়া গ্রামের একটু আগে। চার কিলোমিটার তফাতে দুয়ারসিনি এসে পড়ল।

বন আর বন্য নিয়ে দুয়ারসিনি। তারই আড়ালে নীরব গ্রাম আসনপানি। 'সিনি' শব্দের অর্থ, আদিবাসীদের দেবস্থান, যা পাহাড়ের পাদদেশেই। এ স্থানটিকে স্বর্গের দুয়ারও বলা যেতে পারে। আরও আছে পাহাড়ি ঝোরা, মিলেমিশে হয়েছে সাতগুডুম। পাহাড়ি 'গুডুম' নদীটি একটা হিল কোবরার মতো। ফুঁসে ওঠে বর্ষায় আর শীর্ণকায় হয়ে যায় গ্রীষ্মে। নদীর পূর্বে বিহার আর পশ্চিমে বাংলা। পাহাড়ের চূড়ায় বিহার মুলুক, পাদপ্রান্তে বঙ্গভূমি। বনবিভাগ এমন জংলা নিসর্গ বেছে নিয়েছেন।

১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে, টুরিস্ট স্পট গড়ার কাজ শুরু। দুই মৌজা, কুচিয়া আর আসনপানিতে মোট ১০০ ঘর সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুর্মি, এঁরা নিজেরাই জঙ্গল লালনপালন করছেন। এই ট্রেকার্স হেভেনও তাঁদেরই প্রচেষ্টায় আর দক্ষতায় গড়ে উঠবে বলে পুরুলিয়ার ডি.এফ.ও সাহেব ভাবছেন। প্রকৃতির বন্য স্বভাব একশো ভাগ বজায় রাখতে জঙ্গলের একটা ঘাসও ছাঁটা হবে না। বৈঁচি, পিয়াল, কুসুম, করম, মহুল, পলাশ, শাল ফুলেরা যে-যার ডালে ডালে। পাহাড়ের মাথায়, বুকে ফুটে আছে। বনজ খাদ্যের টানে হায়েনা, হাতি, ভালুক; নিসর্গের টানে মানুষ, লতা মহীরুহের টানে কীট-পতঙ্গ সব মিলে এক পরিবেশ-ভারসাম্য তৈরি হবে।

ইতিমধ্যেই ১৫৫ মিটার পাহাড়চূড়ার কেদারায় বসে দেখা যাবে সামনের প্রাকৃতিক গ্যালারি। যেখানে চিত্রিত হয়ে আছে জেদি বাইসনের মতো একঝাঁক পাহাড়। প্রতিটি পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত হবে ট্রেকিং রুটের শিরা-উপশিরা। সে পাহাড়ের কোনওটা আসনপানি, কোনওটা দুয়ারসিনি। কারও নাম কুচিয়া, সাতগুডুম। দুই মৌজার বেকার যুবকেরা কাজ পাবেন। পরিকল্পনা চমৎকার। ফরেস্ট রেঞ্জার জানালেন, ইকো টুরিজম-এর শর্ত মেনেই সব হচ্ছে। স্থানীয় মানুষেরা কাজের বিনিময়ে অর্থ রোজগার করতে পারবেন। বাজার থাকছে ৪ কিমি পেছনে। তারপর শুধুই পাহাড় অরণ্য আর আরণ্যক। ৩২ বর্গ মিটার তাঁবুঘরে (চারটি তাঁবু) ৮ জন থাকবেন অনায়াসে। সংলগ্ন টয়লেট, পানীয় জল, সব কিছুর ব্যবস্থা হবে। এখানে দুপুর-সন্ধ্যায়-রাত্রে যাপন করা যেতে পারে এক সুন্দর বন-জীবন! সামনে টলটলে সাতগুডুমের জল। তাই বেঁধে প্রাকৃতিক জলাধার। থাকবে প্যাডেল বোট। ছিপ ফেলে শিকার করতে পারবেন রোহিত, মৃগেল।

আরও আছে। স্তব্ধ দুপুরে দুয়ারসিনি পাহাড়ের ছায়ায় শনিবারের শীর্ণ হাট। বাংলা আর বিহার, দুই রাজ্যের গঞ্জের আনাজ-শস্যের প্রদর্শনী, কম কী! কেঁদু, পিয়াল, শীতে বুনো বহেড়া, হরিতকী। মহুয়া ফুলের হাট, —এ-সবই চৈত্রের দুপুরে টুরিস্টরা পাবেন। প্রতি মঙ্গলবার কুচিয়ার হাট। প্রশ্ন আছে, অরণ্যে তাঁবুর ঘরে রাত্রে নিরাপত্তা কোথায়? সে জন্যে, বন দফতরের রক্ষীরা মোতায়েন থাকবেন। তাঁরা থাকবেন টুরিস্টদের সব প্রয়োজনে। পশ্চিমবাংলার সীমান্তের শেষ গ্রাম আসনপানি। আসনপানির মানুষেরাও চাইছেন পাহাড়-অরণ্যের দুয়ার খুলে শহরের অতিথিরা আসুক।

বন বিভাগের পরিকল্পনা পাকা। বাকি আছে উন্নয়ন নিগমের সবুজ সঙ্কেত। তাঁদের জরিপও শেষ। বন বিভাগ ও উন্নয়ন নিগমের চেষ্টায় টুরিস্টরা পাবেন অদ্বিতীয় এক সবুজ পাহাড়ের সার্থক স্বপ্ন।

পথের হদিস : শহিদ মিনার থেকে রাতের সাউথ বেঙ্গল ভোরে পৌঁছবে বান্দোয়ান। ওখান থেকে অটো অথবা ট্রেকারে দুয়ারসিনি। ফেরার উপায় বান্দোয়ান থেকে রাতের সাউথ বেঙ্গল, ভোরে পৌঁছে শহিদ মিনারে। যোগাযোগের ঠিকানা—ডি.এফ.ও., পুরুলিয়া, ডাক ও জেলা—পুরুলিয়া। আবেদনপত্রে 'দুয়ারসিনি ট্রেকার্স হাট' কথাটি লিখতে হবে।

দলমা পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়

ফোটো : সৈকত গুহ

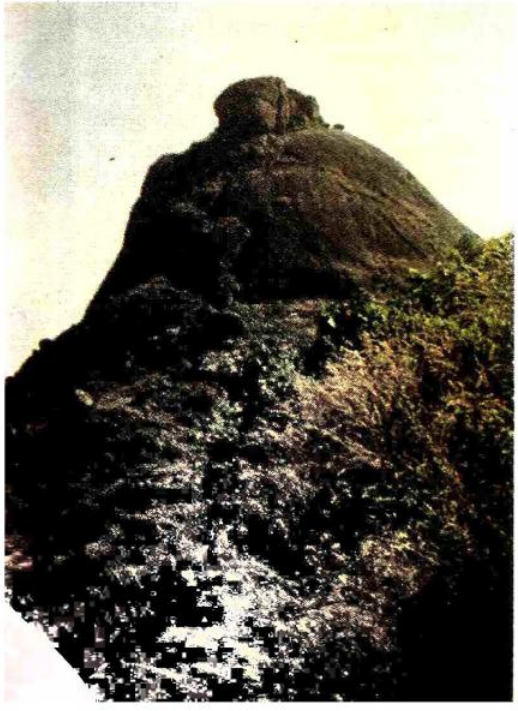

১৫৫ মিটার পাহাড়চূড়ার কেদারায় বসে দেখা যাবে সামনের প্রাকৃতিক গ্যালারি। যেখানে চিত্রিত হয়ে আছে জেদি বাইসনের মতো একঝাঁক পাহাড়। প্রতিটি পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত হবে ট্রেকিং রুটের শিরা-উপশিরা।

মহাকাশ অভিযানে রাশিয়ার

১৯৬১ সালে রুশ নভশ্চর ইউরি গাগারিন মহাকাশে পাড়ি দেন ভস্তক মহাকাশযানে চড়ে। তার পরে কেটে গিয়েছে প্রায় ৪০ বছর। গত চার দশকে রাশিয়ার মহাকাশ অভিযানের সাফল্য নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রদীপচন্দ্র বসু

মহাকাশ অভিযানে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাথমিক সাফল্য এসেছিল 'ভস্তক' ও 'ভোস্‌খোদ' মহাকাশযান ব্যবহার করে। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ইউরি গাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল মহাকাশে যান এই ভস্তকে চড়েই। গোলাকার এই যানের ব্যাস ছিল তিন মিটার এবং ভেতরে ছিল দুটি কক্ষ। ৪৭০০ কেজি ওজনের ভস্তকের প্রথম কক্ষটি নির্দিষ্ট থাকত মহাকাশচারীর জন্য এবং দ্বিতীয় কক্ষে রাখা হত যন্ত্রপাতি। যেসব এ-১ রকেট ভস্তক যানকে মহাকাশে নিয়ে যেত সেগুলির ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা (থ্রাস্ট) ছিল ৬,০০,০০০ কিলোগ্রাম। ভস্তক বাতিল করে সোভিয়েত রাশিয়ার মহাকাশবিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা ভোস্‌খোদ যান ব্যবহার শুরু করেন ১৯৬৫ থেকে।

ভোস্‌খোদ নামের অর্থ সূর্যোদয়। মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে রাশিয়ার এই যান অনেক বিষয়েই প্রথম। যেমন, ভোস্‌খোদে চড়েই সর্বপ্রথম একসঙ্গে একাধিক মহাকাশচারী গিয়েছিলেন মহাকাশে। মহাকাশচারী লিওনেভ মহাকাশে ভোস্‌খোদ ২ থেকে বেরিয়ে প্রথম হাঁটেন। ভোস্‌খোদকে মহাকাশে পাঠাতে ভস্তকের চেয়েও শক্তিশালী রকেট ব্যবহার করা হয়েছে।

ভোস্‌খোদ আকারে ভস্তকের চেয়ে বড় হলেও ভস্তকই প্রথম মহাকাশযান, যা পৃথিবীর কক্ষপথে উপগ্রহের মতো ঘোরে। মহাকাশচারী টিটভ পৃথিবীর প্রথম মানুষ, যিনি মহাকাশে গিয়ে ভস্তক যানে বসে খাবার খান, ঘুমোন এবং একদিনে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেন। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম মহিলা মহাকাশচারী ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা এই ভস্তক চড়েই মহাকাশে গিয়েছিলেন ১৯৬৩ সালের জুনে। ঊর্ধ্বাকাশে থেকে ৪৮ বার পৃথিবী পরিক্রমা সেরে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসেন। মহাকাশের ভারহীন পরিবেশে মানবদেহে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা উপলব্ধি করার জন্য রুশ চিকিৎসক বোরিশ ইয়েগরাফ ১৯৬৪-র অক্টোবরে নিজেই সশরীরে মহাকাশে গিয়েছিলেন ভস্তকে সওয়ার হয়ে।

বছর দুয়েক ভোস্‌খোদ ব্যবহারের পর সোভিয়েত রাশিয়া 'সয়ুজ' শ্রেণীর মহাকাশযান তৈরি করে। রুশ ভাষায় সয়ুজ শব্দের অর্থ, মিলন। সয়ুজকে মহাকাশে পাঠাবার জন্য এক নতুন ধরনের আরও শক্তিশালী রকেট তৈরি করতে হয়েছিল। এই রকেটের দ্বিতীয় স্তর আগে তৈরি রকেটগুলির দ্বিতীয় স্তরের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। উচ্চতায় ছিল মাত্র ৫০ মিটার, যা আমেরিকার স্যাটার্ন শ্রেণীর রকেটের প্রায় অর্ধেক। পাশাপাশি সয়ুজের যান্ত্রিক ব্যবস্থা আমেরিকার অ্যাপোলো মহাকাশযানের চেয়ে ছিল বেশ সহজ ও সরল। সারা পৃথিবী জুড়ে সয়ুজ ও অ্যাপোলোর তুলনা এই কারণে করা হয়ে থাকে যে, মহাকাশে রাশিয়া ও আমেরিকা, তৎকালীন দুই সুপার পাওয়ারের ঐতিহাসিক মিলন এই সয়ুজ ও অ্যাপোলো যানের

স্পেস শাট্‌ল ও সোভিয়েত রাশিয়া

আমেরিকার স্পেস শাট্‌ল 'কলম্বিয়া'-র উড়ানের প্রায় সাত বছর পর ১৯৮৮-র অক্টোবরের শেষে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম স্পেস শাট্‌ল 'বুরান'-এর মহাকাশে যাওয়ার কথা ছিল। এতে অভিযাত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন অভিজ্ঞ মহাকাশচারী ইগর ভোক। উৎক্ষেপণের দিন কাজাখস্তানের বৈকানুর মহাকাশ কেন্দ্রে রকেটের এঞ্জিন চালু করার ৫১ সেকেন্ড আগে কম্পিউটারের এক আকস্মিক নির্দেশে তা স্থগিত রাখা হয়। বুরান সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশে যায় ১৯৮৮-র ১৫ নভেম্বর। এই উড়ানে কোনও অভিযাত্রী ছিলেন না। বুরানের বুস্টার রকেটের নাম ছিল 'এনার্জিয়া'।

রুশ ভাষায় বুরান নামের অর্থ তুষার ঝড়। প্রথমবার মহাকাশে গিয়ে এই স্পেস শাট্‌ল ২০০ মিনিটে পৃথিবীকে দু'পাক খেয়ে নিরাপদে বৈকানুরে নেমে আসে। পরিকল্পনা ছিল পরবর্তী উড়ানগুলিতে একসঙ্গে ১০ জন অভিযাত্রী মহাকাশে যাবেন। এর মধ্যে চারজন চালক ও সহকারী এবং ছ'জন মহাকাশ পর্যটক। উৎক্ষেপণের ৪৭ মিনিটের মধ্যে মহাকাশে পৌঁছে কক্ষপথে একটানা ৩০ দিন থাকবে এই মহাকাশফেরি। বুরান নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার মহাকাশবিজ্ঞানীদের অনেক আশা ছিল।। তাঁরা ভেবেছিলেন, চাঁদ, মঙ্গল ও শুক্র অভিযানে এই বুরান-এ করেই জিনিসপত্র পাঠাবেন। মহাকাশে রুশ গবেষণাগার ও মহাকাশ স্টেশন 'মির'-এ বুরান-এর সাহায্যে মহাকাশচারী ও বিভিন্ন সরঞ্জাম পাঠাবার কথাও ভেবেছিলেন রুশ বিজ্ঞানীরা। কিন্তু এক অজ্ঞাত কারণে বুরানের পরবর্তী উড়ানগুলি খুব সম্ভবত বাস্তবায়িত হয়নি।

রাশিয়া ভেবেছিল মহাকাশ অভিযানে বুরান একদিন ধারাবাহিক সাফল্যের ঝড় তুলবে। বাস্তবে এই ঝড় ওঠার আগেই বুরান প্রকল্পে সাময়িক বিরতির পরদা ফেলা হয়েছে।

সাফল্যও কম নয়

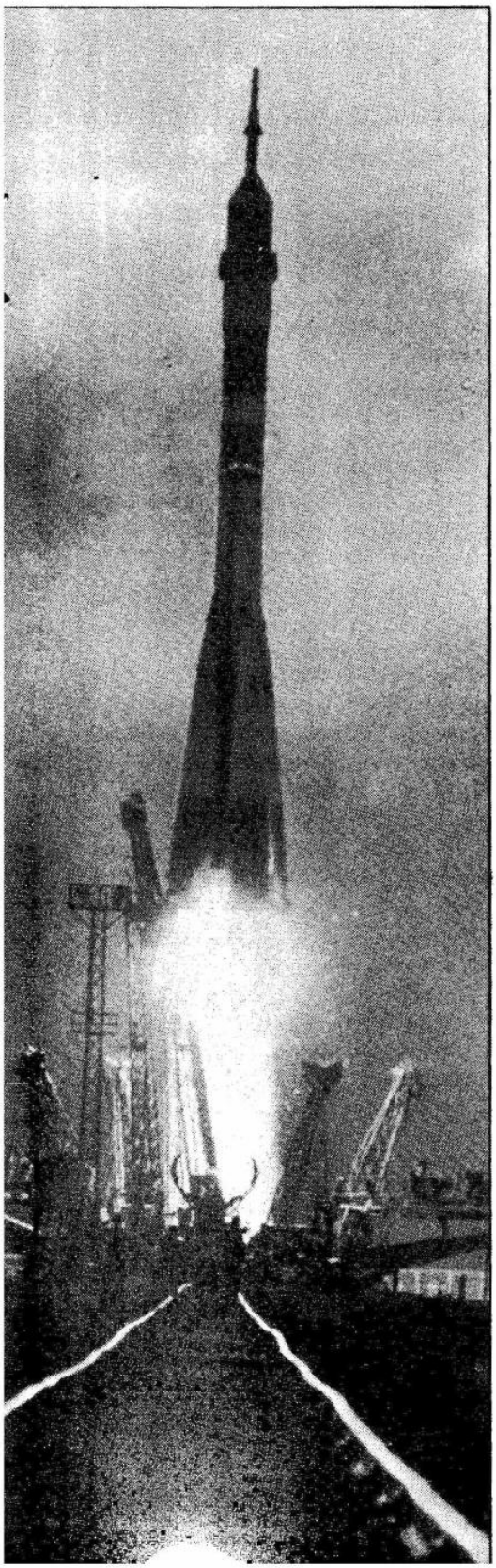

মাধ্যমেই হয়েছিল। যুগান্তকারী এই ঘটনাটি পৃথিবীতে বসে টেলিভিশনে মানুষ দেখেছে ১৯৭৫-এর ১৭ জুলাই।

মহাকাশচর্চায় পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং নবগঠিত রাশিয়াকে সবচেয়ে বেশি সাফল্য এনে দিয়েছে সয়ুজ মহাকাশযান। রাশিয়ার প্রথম মহাকাশ স্টেশন স্যালুটে জিনিসপত্র গেছে সয়ুজে চড়ে। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি মাসে মহাকাশে এক মহাকাশযান থেকে আর-এক যানে মহাকাশচারীদের যাতায়াতের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন রাশিয়ার মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা। এতে অংশ নিয়েছিল সয়ুজ ৪ ও ৫ মহাকাশযান। মহাকাশচারী ইয়েলিসিয়েভ ও খুরনভ সয়ুজ ৫ থেকে সয়ুজ ৪-এ গিয়েছিলেন। ১৯৭১-এর জুনে এই সয়ুজে চড়েই প্রথম মহাকাশচারীর দল স্যালুট স্টেশনে যান। প্রায় ৩০ বছর হয়ে গেল, সয়ুজ মহাকাশযান রাশিয়া এখনও ব্যবহার করছে।

মহাকাশ অভিযান শুরুর পর প্রথম দু'দশকে রাশিয়া প্রায় ১০০০ কসমস উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কারিগরি পরীক্ষাকার্য চালানো এবং উপগ্রহ নির্মাণ ও উৎক্ষেপণ ব্যবস্থাকে নিখুঁত করার জন্যই এত উপগ্রহ প্রেরণ। প্রথম কসমস মহাকাশে যায় ১৯৬২-র ১৬ মার্চ। কসমস ১১০-এ চড়ে ২২ ফেব্রুয়ারি,১৯৬৬ তারিখে মহাকাশে গিয়েছিল দুটি কুকুর। প্রায় তিন সপ্তাহ মহাকাশে থেকে ৩৩০ বার কক্ষপথ পরিক্রমার পর উপগ্রহ সমেত কুকুর দুটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়। কসমস ৬৩৭ পৃথিবী থেকে ৩৬০০০ কিলোমিটার উচ্চতায় রাশিয়ার প্রথম ভূ-স্থির উপগ্রহ। মহাকাশে দুটি উপগ্রহের জোড় বাঁধা বা ডকিং-এর পরীক্ষা রাশিয়া প্রথম করেছিল কসমস-১৮৮ ও কসমস-১৮৬-র সাহায্যে।

কসমস উপগ্রহগুলি মহাকাশে পাঠানোর ফাঁকে-ফাঁকে রুশ বিজ্ঞানীরা ১৯৬৯-এর মার্চে আবহাওয়া অনুসন্ধানী উপগ্রহ মিটিওর ১, প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ মলনিয়া ১ এবং মহাকাশ গবেষণার জন্য ১৩ টন ওজনের বিশাল উপগ্রহ প্রোটন ১-কে মহাকাশে পাঠান। একটি রকেটের সাহায্যে একই সঙ্গে দুটি উপগ্রহকে মহাকাশে নিয়ে গিয়ে দুই ভিন্ন কক্ষপথে স্থাপনের জটিল পরীক্ষায় রুশ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা প্রথম সফল হন ১৯৬৪-র ৩০ জানুয়ারি। উপগ্রহ দুটির নাম ছিল ইলেকট্রন-১ ও ইলেকট্রন-২।

কসমস ১১০-এ চড়ে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তারিখে মহাকাশে গিয়েছিল দুটি কুকুর। প্রায় তিন সপ্তাহ মহাকাশে থেকে ৩৩০ বার কক্ষপথ পরিক্রমার পর উপগ্রহ সমেত কুকুর দুটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়।

পশুপাখিদের সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার নতুন জায়গা জীবাশ্রম

বাড়ির পোষা বেড়াল, নিরাশ্রয় পথের কুকুর কিংবা ইট-পাটকেলে ক্ষতবিক্ষত পায়রা চড়ুই— দিল্লির একটি গ্রাম এখন থেকে অত্যাচারিত পশুপাখিদের নতুন ঠিকানা। আশ্চর্য দরদ আর ভালবাসা দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে জীবাশ্রম। লিখেছেন জয় সেনগুপ্ত

একটানা ছুটি পেলে কার না ইচ্ছে করে কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়িয়ে আসতে। কিন্তু বাড়িতে যদি থাকে আদরের পোষা কোনও প্রাণী, যাকে নিয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়, তা হলে? সেরকম নির্ভরযোগ্য জায়গাই বা কোথায়, যেখানে বাড়ির পোষা কুকুর, বেড়াল কিংবা গোরুটিকে রেখে যাওয়া যেতে পারে ছুটি কাটাতে। এজন্য সবসময় দরজা খুলে রেখেছে 'জীবাশ্রম'। না এটি কলকাতার কোনও প্রতিষ্ঠান নয়। দিল্লির দক্ষিণ-পশ্চিমের একদম শেষপ্রান্তে আছে রাজোকরি গ্রাম। এখানে লেখা পোদ্দারের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এই জীবাশ্রম।

এক কথায় জীবাশ্রম হল জীবজন্তুদের আশ্রয়স্থল। এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য, জীবজন্তুদের ওপর মানুষের অত্যাচার বন্ধ করা। পাঁচ একর জমির

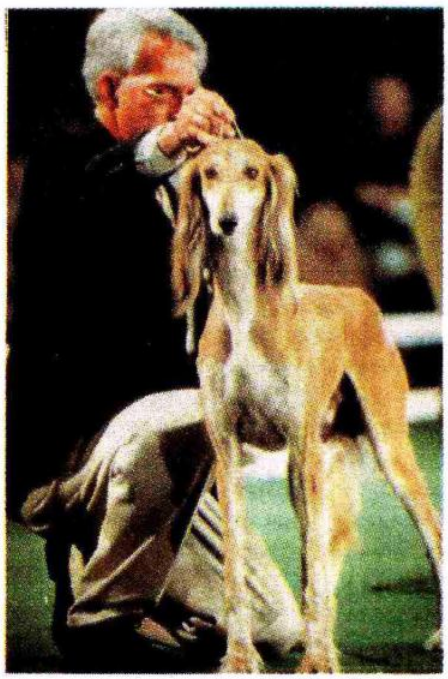

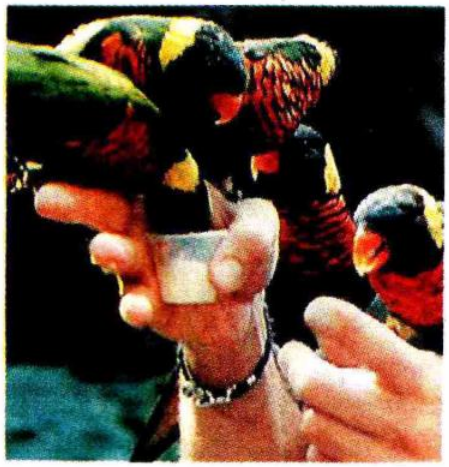

ওপর তৈরি এই প্রতিষ্ঠানটিতে বাড়ির পোষা প্রাণী অথবা খামারের জীবজন্তু— সকলকেই যত্ন আর দরদ দিয়ে দেখাশোনা করা হয়।

জীবাশ্রমে আছে দুটি আলাদা বিভাগ। একটি বাড়ির পোষা ছোট্ট জীবজন্তুদের জন্য, অন্যটি খামারের গৃহপালিত পশুদের জন্য। কুকুরদের জন্য আছে তিনটি বিশাল 'কম্পাউন্ড', আর ১৮টি থাকবার জায়গা। বেড়ালের জন্য আছে সম্পূর্ণ আলাদা থাকবার ব্যবস্থা।

জীবজন্তুরা একেবারে মুক্ত এখানে। কুকুরের গলায় চেন পরানো হয় না। স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় তারা। জীবাশ্রমের এলাকার মধ্যেই আছে বেশ কয়েকটি ঘর। আছে 'অপারেশন থিয়েটার', 'ডিসপেনসারি', জীবজন্তুদের স্নান করাবার জন্য আলাদা জায়গা, 'গেস্টরুম' আর 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক'।

দলছুট পরিত্যক্ত কুকুরদের বিশেষ আশ্রয়স্থল এই জীবাশ্রম। এখানকার পশু হাসপাতালে শুধুমাত্র অসুস্থ প্রাণীদের চিকিৎসাই যে করা হয় তা নয়, এদের ওপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালান চিকিৎসকরা।

'রয়াল সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব দ্য ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমালস' (ইউ কে)'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে জীবাশ্রম। এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানটি 'ওয়ার্ল্ড সোসাইটি ফর দ্য প্রোটেকশন অ্যান্ড কেয়ার অব অ্যানিম্যালস'-এর সদস্য।

জীবাশ্রম অসহায় জীবজন্তুদের আশ্রয়স্থল তো বটেই, সেইসঙ্গে পোষা প্রাণীদের প্রতি আমরা যাতে যত্নবান হতে পারি, পশুপাখিদের সঙ্গে যাতে নির্দয় আচার-আচরণ না করি, তারই বার্তা সারা পৃথিবীতেই পৌঁছে দিচ্ছে এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি।

ফোটো : অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটের সৌজন্যে

অপমান আর লাঞ্ছনায় কেটেছে অম্বেডকরের ছেলেবেলা

অনেকদিন বাবা বাড়ি ফেরেননি। তাঁর কর্মস্থল গোরেগাঁওতে তখন তিনি খুব ব্যস্ত অফিসের কাজে। ভীমের যেন কিছুই ভাল লাগে না। বাবার জন্য মন কেমন করে। কোনও অসুখ হয়নি তো?

তখন ভীম স্কুলে উঁচু ক্লাসের ছাত্র। দাদা বলরামকে একদিন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা দাদা, বাবা কেন আসছেন না অনেকদিন?"

"তাই তো ভাবছি।"

"অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?"

" কী করে বলব!"

"চল না, বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

ভীমও দাদা বলরামের সঙ্গে পরামর্শ করল অনেকক্ষণ। তারপর ঠিক করল, তারা বাবার কাছে যাবে। চিঠিতে বাবাকে এ-কথা জানিয়ে দিল। তারপর একদিন মুম্বইয়ের সাতারা থেকে তারা ট্রেনে চাপল। মাসুর স্টেশনে নেমে দেখল, তাদের নিতে বাবা আসেননি। কী করবে তারা? ঠিক করল, গোরুর গাড়িতে তারা নিজেরাই যাবে।

চেপে বসল গোরুর গাড়িতে। কিন্তু তখন কি জানত, পথে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে অনেক বিপত্তি। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই গাড়োয়ান কী করে যেন টের পেয়ে গেল যে, তারা জাতিতে মাহার। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। গাড়ি থেকে নীচে ফেলে দিল তাদের সব জিনিসপত্র। তার গাড়ি অপবিত্র হয়ে গেছে বলে গালিগালাজও করল অনেক।

ভীম হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করল। বলল, "দয়া করে পৌঁছে দিন। এখানে এর আগে আমরা কখনও আসিনি।"

"আসিসনি তো আমার কী? আগে বলিসনি কেন, তোরা অস্পৃশ্য?"

"ভুল হয়ে গেছে।"

"ভুল যখন করেছিস, তখন প্রায়শ্চিত্ত কর। হেঁটে যা।"

"রাস্তা চিনি না যে!"

শেষ পর্যন্ত একটা ফয়সালা হল। ঠিক হল, তারা দ্বিগুণ ভাড়া দেবে এবং নিজেরাই গাড়ি চালাবে। গাড়োয়ান পায়ে হেঁটে যাবে তাদের সঙ্গে। পৌঁছে পুরো গাড়ি ধুইয়ে দিতে হবে। গোরু দু'টিকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করে দিতে হবে।

এমনি এক সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল বর্তমান মধ্যপ্রদেশের মাহুতে জন্ম হয় ভীমরাও রামজি অম্বেডকরের। তাঁর কুল-পদবি ছিল শকপাল। কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষদের কোনও একজন এই পদবি বদল করে তাঁদের গ্রামের নাম 'অম্বেডকর' পদবি হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন।

অম্বেডকরের ছেলেবেলা ছিল দুর্ভাগ্য অপমান আর লাঞ্ছনায় ভরা। স্কুলে অস্পৃশ্য হওয়ার অপরাধে তাঁকে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতে দেওয়া হত না। বাড়ি থেকে আনা মাদুরে তাঁকে বসতে হত। শিক্ষকরা তাঁর খাতা পরীক্ষা করতেন দূর থেকে। অস্পৃশ্য ছাত্রের খাতা স্পর্শ করলেও নাকি পাপ হয়। তেষ্টা পেলে জল খেতে চাওয়াও ছিল অস্পৃশ্যদের পক্ষে গুরুতর অপরাধ। ক্লাসের বাইরে ওপরের দিকে মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হত তাঁকে। কোনও উচ্চবর্ণের ছাত্রের হৃদয়ে সহানুভূতি জাগলে সে উঁচু থেকে জল ঢেলে দিত, তাতেই তেষ্টা মিটত তাঁর।

মাত্র ছ' বছর বয়সে তিনি হারান মা ভীমাবাঈকে। পিসিমা মীরাবাঈ তখন থেকেই স্নেহ-মমতায় মানুষ করতে থাকেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ভীমের মধ্যে রয়েছে অনেক সম্ভাবনা। তাঁর সে-ধারণা অমূলক ছিল না।

বরোদার মহারাজ সয়াজিরাও গায়কোয়াডের কাছ থেকে বৃত্তি নিয়ে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য যান আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। বলা যায়, অম্বেডকরের জীবনে এ যেন এক রূপান্তর। সেখান থেকে তিনি ১৯১৫ সালে অর্থনীতিতে এম. এ পাশ করেন। পরের বছর 'ভারতের জাতীয় লভ্যাংশ' লিখে পিএইচ. ডি পান। আইনবিদ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, সাংসদ হিসেবে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনায় তিনি ছিলেন প্রধান রূপকার। ভারতের দলিত শ্রেণীর মানুষদের অ'ধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৫৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহাপরিনির্বাণ ঘটে এই মহান মানুষটির।

অস্পৃশ্য হওয়ার অপরাধে বি. আর. অম্বেডকরকে স্কুলে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতে দেওয়া হত না। বাড়ি থেকে আনা মাদুরে তাঁকে বসতে হত দূরে। পরে ইনিই হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের সংবিধানের অন্যতম রূপকার। লিখেছেন আশিস সান্যাল

সেকেন্ড মাস্টারমশাই

রঞ্জন প্রসাদ

নগেনবাবুর কথা আজ বড় বেশি করে মনে পড়ে। বিশেষ করে ইদানীং এই হয়-কে নয় আর নয়-কে হয় হতে দেখবার দিশেহারা অসময়ে। মাঝে-মাঝেই চোরাবালির অতলে ডুবন্ত অসহায় পায়ের নীচে জমি খোঁজার মতো মনে পড়ে নগেন মাস্টারের মুখ।

নগেনবাবু ছিলেন আমাদের ইস্কুলের সেকেন্ড মাস্টারমশাই। আধময়লা ধুতি শার্ট আর একমুখ খোঁচা-খোঁচা না-কামানো দাড়িগোঁফে তাঁকে বেশ রুক্ষ দেখাত বলে আমরা যথেষ্ট সমীহ করেই চলতাম। সেকালের মফস্বলের ইস্কুল, পড়ুয়ারা অনেকেই অভাবী, গরিব বাড়ির

প্রথম প্রজন্মের বই-শেলেট ধরা ছেলেপুলে। তাদের শুধু পড়াতে নয়, ঠিকমতো মানুষ করতেও নগেনবাবুর ছিল প্রাণপণ চেষ্টা। এখনও কানে ভাসে ক্লাসরুমে গমগম করা তাঁর কণ্ঠস্বর, "প্রবাদে বলছে লেখাপড়া করে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই, আমি কিন্তু তোদের তা বলছি না বাপ। ঘুষের লোভ দেখিয়ে বিদ্যার্জনের দৌরগোড়াতেই তোদের শিক্ষার পিণ্ডি চটকানোর কোনও অভিলাষ আমার নেই। কেবল মনে রাখবি সঠিক লেখাপড়া শিখলে সেই গাড়ি আর ঘোড়াটাও জনকল্যাণে ব্যবহৃত হয়, নিজের জন্য নয়। সেটাই সব শিক্ষার সার।"

ননীগোপাল ছিল আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে পাজি ছেলে। দুষ্টু বুদ্ধিতে তার কোনও জুড়ি ছিল না। সারা ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে সে গোলমাল পাকিয়ে বাহাদুরি নিত, সে সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ছেড়েই হোক, বা নানা ধরনের দৌরাত্ম্য করেই হোক। নগেনবাবু তাকে দু' চোখে দেখতে পারতেন না। শাসনও করতেন শোধরানোর জন্য। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। তার কোনও চৈতন্য হত না। শেষটায় তার জোতদার বাবা হেডমাস্টারমশাইকে ধরে তার রেহাইয়ের জন্য একটা রফা করলেন। সে কেবল ক্লাসে আসবে-যাবে, আর ক্লাস টেন অবধি প্রমোশন পাবে। বদলে ইস্কুলের লাগোয়া তার সওয়া তিন বিঘে পতিত জমিটা ইস্কুলের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। সবাই মনে মনে খুশি হলেও নগেনবাবু কিন্তু এই প্রস্তাবে রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ধনুকভাঙা পণ এ ব্যবস্থা চলবে না। কিন্তু হেডমাস্টারমশাইয়ের কথার ওপর তো সেকেন্ড মাস্টারমশাইয়ের কথা চলতে পারে না, আর তা চললও না। গোবেড়েন থেকে রেহাই পাওয়া ননীগোপালের আকর্ণ হাসি দেখে ক্লাসরুমে সক্রোধে তিনি বলে উঠলেন, "যত হাসি, তত কান্না, বলে গেছে রাম সন্না। হেসে নে, কত হাসবি—আখেরে কাঁদতে হবে, আমিও বলে রাখছি।" বলে ক্লাসের পর টিচার্স রুমে গিয়েই চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু ইস্কুলের কমিটি তাঁর ইস্তফা মঞ্জুর করল না। এমন শিক্ষক পাবে কোথায়? কেবল তাঁর অটুট জেদের মর্যাদা রাখতেই বোধ করি, তাঁর সেকশনটা পালটে দেওয়া হল, যাতে ননীগোপালের মুখদর্শন তাঁকে আর করতে না হয়। এইভাবে পরিস্থিতিটা সে-যাত্রা সামলে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য! নগেনবাবুর কথা একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গেল। ননীগোপালের বাস্তবিক শেষরক্ষা হল না। টেস্টে অ্যালাউ হলেও ফাইনালে দারুণ ধ্যাড়াল ননীগোপাল। ইস্কুলের সব ছাত্র পাশ হল, কেশব আর আমি পেলাম জলপানি। কেবল ননীগোপাল ফেল। সেদিন তার কাঁচুমাচু স-সে-মি-রা মুখ দেখে নগেনবাবুর কথাটা আর-একবার হৃদয়ঙ্গম করলাম। তখন আমার বয়স সবে ষোলো।

এর পর একে-একে চল্লিশটা বছর কেটে গেছে। চুলের সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুদ্ধিতেও পাক ধরেছে। বুঝতে পারি, সময় বদলেছে, কিন্তু তার সঙ্গে নিজেরও কী পরিমাণে বদলানো উচিত, বুঝে উঠতে পারিনি এখনও। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে কেশবের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। বরাবরের মেধাবী সেই ছাত্র এখন নামকরা ডাক্তারবাবু। শহর থেকে ডাক্তারির পড়াশোনা শেষ করে নিজের জায়গা মফস্বলেই ফিরে এসে ডাক্তারি শুরু করেছিল। এখন সেও প্রৌঢ়। ঘোড়া না হলেও এতদিনে তার একটা গাড়ি হয়েছে। রেডক্রশ লাগানো সেই সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়িতে সে এখন তল্লাট চষে রুগি দেখে। নগেনবাবুর শিক্ষার অর্থটা হুবহু ফলে গেছে তার জীবনেও। তার ওই সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ির সুফল ভোগ করে এই এলাকার, এবং তার বাইরেও, অজস্র মানুষ।

আমার জীবনে অবশ্য বড় কিছু করে ওঠা সম্ভব হয়নি। সাধারণ ঘরের ছেলে, ভাল রেজাল্ট থাকলেও দীর্ঘদিন উচ্চশিক্ষার দায় মেটানো আমার পরিবারের মুখ চেয়েই সম্ভব ছিল না। ছোট ছোট ভাইবোন, বাবার সামান্য রোজগার, তাই চটপট কারিগরি বিদ্যায় একটা ডিপ্লোমা নিয়ে ওভারশিয়ার হয়েছিলাম। এখন কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে এসে অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার হয়েছি, তবে প্রোমোটি । ডিগ্রি পাশ না করতে পারার ব্যথা বেশ কিছুদিন মনে-মনে ছিল, তবে হালের উঁচু ডিগ্রি এবং আরও উঁচু পেডিগ্রির ফুলবাবুদের দেখে সে দুঃখটা আর নেই। তাই আমার সামান্য বিদ্যাতেই এই গরিব দেশের জন্য যেটুকু করা যায়, তারই চেষ্টা করি। নগেন মাস্টারমশাইয়ের শিক্ষাটা কাজে লাগাতে

গিয়ে নিজের গাড়ি-বাড়ি হয়নি এ-জীবনে, তবে এতদিনে বেতো ঘোড়ার মতো একটা জিপগাড়ি মাঝেমধ্যে পেয়ে থাকি। সেটাও আবার সাইটের কাজকর্ম দেখতেই কাজে লাগে। কাজেই নগেন মাস্টারমশাইয়ের এখানেও জিত।

এইসব কথা মনে আসতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। কতদিন নগেনবাবুকে দেখিনি। এখন তাঁর বয়স হয়তো আশি কি তারও বেশি হবে। অবসর নেওয়ার পর এ-গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন দূরে নিজের মেয়ে-জামাইয়ের কাছে, তারাই এসে নিয়ে গিয়েছিল। একে বিপত্নীক, তায় ছেলে ছিল না তাঁর, কে দেখবে। আমরাই তো ছিলাম তাঁর ছেলের মতো। কেশব তখন কলকাতায় এম.ডি করতে ব্যস্ত, আমিও অন্যত্র পোস্টেড। আমরা তাঁকে সেভাবে ধরে রাখতে পারিনি। আর সে চেষ্টা কতদূর ফলপ্রসূ হত, তাও বড়মুখ করে বলতে পারি না। আমরাও তো ততদিনে নানা কাজে আর পারিবারিক দায়ে জড়িয়ে পড়েছি, গণ্ডিতে জীবন বাঁধা। তবে একবার স্বচক্ষে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম। আমাকে দেখে তাঁর সে কী আনন্দ। আসবার সময় বলেছিলেন, "দ্যাখ বাবা রতন, ওভারশিয়ার হয়েছিস, পারিস তো ইস্কুল বাড়িটার একটু সংস্কার করে দিস। সেটাই হবে তোর আসল গুরুদক্ষিণা।"

তা এতদিনে সেই পর্বটি সমাধা হয়েছে। অনেক লেখালেখির পর স্কুলবাড়িটার মেরামতির সরকারি আদেশ ও টাকা যখন পাওয়া গেল তখন আমি এগজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলে সে-কাজের দায়িত্ব চাইলাম। তিনিও আমাকে বিশেষভাবে চিনতেন ও আমার ওপর বিশ্বাস রাখতেন বলে আমাকে তাঁর দায়ভার বুঝিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে আজ সেই বাড়িটা ঝকঝকে নতুন হয়ে দাঁড়িয়ে যেন হাসছে। নতুন ভবনটি উদ্বোধন করতে আসছেন এখনকার একজন নামকরা ডাকাবুকো নেতা—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল হালদার। ইনি যে কতবড় নেতা তা বলে বোঝানো যায় না। যেমন দলাদলিতে, তেমনই প্রতিপত্তি ও সম্পত্তিতে। বাড়ি-গাড়ি, সোনাদানা, টেম্পো-ট্রাক কী নেই! লোকে বলে এঁর হাতে ধুলোমুঠি নাকি সোনামুঠি হয়ে যায়। লাখে এক তো দুরন্তর, এমন মানুষ নাকি কোটিতে গুটিক মেলে। আবার বইও লিখেছেন। তার মধ্যে 'পুঁজি ছাড়া রুজি' আর 'কষ্ট বিনা কেষ্ট' এ-দুটো তো আজ বাংলার ঘরে-ঘরে সমাদৃত। এতে তিনি নাকি সহজে পয়সা উপায় করার চারশো কুড়ি রকম রাস্তা বাতলেছেন, যা কিনা অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিপ্লব এনে দিতে পারে বলেই বিদগ্ধ মহলের বিশ্বাস। আর সবচেয়ে বড় কথা, এহেন একজন কৃতী পুরুষ নাকি এই এলাকারই ছেলে, এককথায় ভূমিপুত্র—সান অব দ্য সয়েল। তাই তাঁকে স্বাগত জানাতে সাজো-সাজো রব পড়ে গেছে।

অবশেষে সেই শুভক্ষণ এল। ভেঁপু বাজিয়ে হাঁউ-মাউ-খাউ করতে করতে রূপকথার ড্যাবডেবে লাল একচক্ষু দত্যি-দানোর মতো গাড়ির কনভয় এসে থামল ইস্কুল-বাড়িটার লোক গিজগিজ-করা চত্বরে। গাড়ি থেকে নামতেই ঠিক চেনা গেল—হ্যাঁ, অবিকল সেই ননীগোপালই বটে, তবে এ-চেহারার জেল্লাই আলাদা। সাঙ্গোপাঙ্গরা ঘিরে আছে যেন আলোর চারপাশে ব্যস্ত পোকার দল। আমার হাতে গড়া নতুন ইস্কুলবাড়ির ঝলমলে ফিতে কেটে দ্বারোদ্ঘাটন করে সদলবলে ভেতরে ঢুকে গেলেন তিনি। পেছনে পেছনে আমরাও। বাড়িটার নির্মাণকার্যের দায়িত্বে ছিলাম, সেই সুবাদে একটা নামমাত্র নিমন্ত্রণপত্র আমারও জুটেছিল, তাই সেই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের এককোণে আমারও ঠাঁই হল। ভেতরে গিয়ে দেখি কেশবও এসে হাজির। নামী ডাক্তার বলেই বোধ করি, ওর বসার জায়গাটা আরও একটু সামনের দিকে। তবে আমাকে দেখতে পেয়ে ও নিজে থেকেই সেখান থেকে উঠে এসে আমার পাশে বসল। বলল, "তুই যে ও বাড়িটা করেছিস, আমি সে-খবর পেয়েছি রে! তাই ছুটে এলাম। আজকের সন্ধেটার মতো আমার ডাক্তারির ছুটি।"

দু'বন্ধুতে পাশাপাশি বসে অনুষ্ঠান দেখছি। মাল্যদান, উদ্বোধন-সঙ্গীত ইত্যাদি সব মামুলি পর্ব চুকে যাওয়ার পর শুরু হল বিশেষ আকর্ষণ, প্রধান অতিথির ভাষণ। আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার পেছনে এহেন ব্যস্ত নেতার যে কতবড় আত্মত্যাগ লুকিয়ে আছে তার লম্বা ফিরিস্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল সকলে। বক্তৃতা থামতেই শুরু হল হাততালি আর জয়জিগির লাগাতার, সে আর থামতেই চায় না। এরই মধ্যে সহসা ও কী! সভার মাঝখান থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন একজন পলিতকেশ অশীতিপর বৃদ্ধ। টলমলে পদক্ষেপে উনি মঞ্চের দিকেই এগিয়ে চলেছেন আর হাত তুলে জানাচ্ছেন যে, উনি কিছু বলতে চান। বিস্ময়াবিষ্ট জনতার কলোচ্ছ্বাস নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। হতভম্ব আমি আর কেশবও, —নগেন সারকে চিনতে আমাদের দু'জনেরই এতটুকু ভুল হয়নি। কী আশ্চর্য, উনি যে এখানে এসেছেন, তাই তো জানতাম না। ওঁকে বোধ হয় নিমন্ত্রণও করেনি এখানকার কর্মকর্তারা।

যাই হোক, উনি মঞ্চে উঠে এলেন। ওঁর বয়সের ভারেই সম্ভবত অথবা বিস্ময়ে, সেরকম আপত্তি তুলল না উদ্যোক্তাদের দলবল, দু-একজন বাধা দিতে এগিয়ে এসেও হাত গুটিয়ে রইল, বোধ হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে। দেখলাম ওঁর হাঁটুদুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, মাইকের সামনে দাঁড়াতে গিয়ে দু'বার উত্তেজনায় কাঁপল ঠোঁটদুটোও থরথর করে। তারপরেই কেটে গেল তাঁর আড়ষ্টতা। কথা শুরু করতেই ভেসে এল তাঁর সেই কণ্ঠস্বর, আর এত বছর পরে ক্লাসরুমে শোনা সেই স্বর সারা প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে পড়ল, যেন বহুদিন পর রুদ্ধ ঝরনার ধারা বাঁধ ভেঙেছে বদ্ধ গুহামুখ থেকে। উনি বলে চললেন, "আমি এই ইস্কুলের একজন মাস্টার ছিলাম, সেকেন্ড মাস্টার। আজ আমার মতো গর্বিত এখানে আর কেউ নেই, কারণ আমার এক ডাক্তার ছাত্রের সদুপার্জনের দানে এই বাড়ি হয়েছে, এবং যাঁর তদারকিতে এটা হয়েছে, সেই বাস্তুকারও আমার ছাত্র।"

আমি আশ্চর্য হয়ে কেশবের দিকে তাকিয়ে বলতে গেলাম, "এতক্ষণ এ-কথা বলিসনি তো একবারও।" উত্তরে সে ঠোঁটে আঙুল রেখে তীক্ষ্ণ চাহনিতে আমার দিকে চাইল, সে চাহনির অর্থ, এতে এত বলার কী আছে। কীই বা এমন করেছি যে বলে বেড়াতে হবে, নিজের ইস্কুল বই তো নয়! দেখলাম, উত্তেজনায় ওরও সারা শরীর টান টান হয়ে উঠেছে, যেন এখনই কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

সমস্ত সভা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, একটা পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে যেন। নগেন মাস্টারমশাই বলে চললেন, "কেশব, রতন, তোরা কি আছিস, শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা? তোদের কাছে আমার যে ক্ষমা চাইবার আছে বাবা। তোদের আমি সেদিন ভুল শিক্ষা দিয়েছিলাম, আজ শুধরে নিতে এসেছি। সেদিন আমি সবার সামনে একজনকে বলেছিলাম যত হাসি, তত কান্না বলে গেছে রাম সন্না, আর তা ফলেওছিল। কিন্তু আমি আজ দেখতে পাচ্ছি যে, সেদিন ফেল করে কেঁদে-ককিয়েও সে যে জায়গায় পৌঁছেছে, আমার সেরা ছাত্র হয়েও তোরা তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারিসনি। আমার সামনের সারির রত্নরা আজ সমাজের পেছনের সারিতে পড়ে রইল, মাথায় বয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পেছনের বেঞ্চের লোকগুলো, এ-আমারই পরাজয়। আমি আজ সবার সামনে দাঁড়িয়ে আমার সেই ভুল শিক্ষার সংশোধন করছি, তোরাও বাড়ি গিয়ে তোদের ছেলেপুলে নাতিপুতিদের সেটাই শেখাস, আমার দেওয়া আগের শিক্ষাগুলো সব ভুলে যাস। তাদের বলিস, তোদের নগেনমাস্টার শিখিয়েছিল যত কান্না তত হাসি, বলে গেছে ঠকের মাসি, আর কিছুই সে শেখাতে পারেনি।"

এতক্ষণে বৃদ্ধের এই কথাগুলোকে উন্মাদের দুর্বোধ প্রলাপ মনে করে সভায় উচ্চ হাসির রোল উঠল। মঞ্চে দাঁড়ানো বৃদ্ধকে ঘিরে সবাই হো হো করে হাসছে, শুধু আহত শার্দুলের মতো জ্বলছে তাঁর চোখদুটো। দমকে দমকে সে হাসি বাড়তেই লাগল। একসময় মনে হল মঞ্চে, প্রেক্ষাগৃহে, ব্যালকনিতে সকলে হাসছে, চার দেওয়াল হাসছে, চেয়ারগুলো হাসছে, সিলিং ফ্যানগুলো হাসছে অট্টহাস্য। অসহায় বৃদ্ধ সিংহকে ফাঁদে পেলে হিংস্রলোলুপ হায়েনার পাল যেরকম হাসে—এ ঠিক সেইরকম হাসি।

আর চারপাশের সেই হাসির রোলের মাঝখানে হঠাৎ দেখলাম আমার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে প্রাণপণে কান্না চাপছে কেশবও।

ছবি : দেবাশিস দেব

হার না মানা হার

প্রবীর জানা

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই বঙ্গভূষণের মনে হল, হেঁতাল শ্যাওড়া কেয়া গাছের ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে দীর্ঘ শোষণের ইতিহাস।

কানাইলালের সারা শরীর উত্তেজনায় ফুটছে গরম জলের মতো। হুগলি নদীর ঢেউয়ের মাথায় জ্বলে উঠছে ফসফরাসের স্ফুলিঙ্গ। না কি ঝাঁক ঝাঁক বুলেট এগিয়ে আসছে ওদের লক্ষ্য করে? থমকে দাঁড়ান কানাইলাল!

ক্লাস টেনের ছাত্র কিশোর বঙ্গভূষণ। সে পরেছে খদ্দরের ধুতি আর খদ্দরের আধময়লা হাফহাতা জামা। কোমরের বেল্টের সঙ্গে চামড়ার খাপে আটকানো রিভলভার, অতর্কিতে গর্জে ওঠার জন্য ছটফট করছে যেন। বঙ্গভূষণ জামার ওপর কোমরে হাত রেখে দেখে নেয় রিভলভারটা ঠিক আছে কি না। কয়েকদিন আগে ইতিহাসের পাতা ওলটাতে ওলটাতে তার চোখে পড়েছিল একসময় মগ ও পর্তুগিজরা হুগলি নদীর এই অববাহিকায়, অবাধে লুটপাট করত। উত্তরে গড়চক্রবেড়িয়া, দক্ষিণে সোনাচূড়া খেজুরি ও হিজলি সংলগ্ন অঞ্চল ছিল তাদের অবাধ বিচরণভূমি। কয়েক ক্রোশ হাঁটলে চোখে পড়বে নরঘাট বা নরহাট। শোনা যায় এখানে মানুষ কেনাবেচা হত এক সময়। দস্যুরা জোর করে গ্রাম থেকে মানুষ ধরে আনত। বিক্রি করত এই হাটে। লোকে তাদের কিনে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করত। কখনও-কখনও অনেকের হাতের চেটো ছাঁদা করে তার মধ্যে লোহার তার ঢুকিয়ে হাতগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে দিত। তারপর তাদের রেখে দিত জাহাজের ডেকে, যাতে তারা না পালিয়ে যেতে পারে। ক্ষুধার্ত এইসব মানুষের সামনে ছড়িয়ে দিত কয়েক মুঠো ভাত, গম বা ঘাসের বীজ। মানুষগুলো যখন খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করত, ওই দস্যুরা তা দেখে আনন্দে উল্লাস করত। যাদের শরীরে ক্ষমতা বেশি তাদের জাহাজের দাঁড় টানার কাজে লাগাত। তাদের হাত শক্ত করে লোহার চেন দিয়ে বাঁধা থাকত জাহাজের সঙ্গে। ক্লান্ত হয়ে দাঁড় টানা বন্ধ করে দিলে তাদের পিঠে পড়ত চাবুক।

বাংলার সুবেদার সুলতান সুজা এক সময় হুগলি নদীর এই অববাহিকায় তৈরি করিয়েছিলেন গুপ্ত গড়, দস্যুদের আক্রমণ থকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য। এই অঞ্চলের মানুষ তখন সৈন্য হিসেবে কাজ করত। বঙ্গভূষণের মনে হয়, তার শরীরেও তো আছে বীরের রক্ত। ব্রিটিশদের ভয় করবে কেন!

তামাটে গায়ের রং, মাঝবয়সী যুবক কানাইলাল। লম্বায় ছ' ফুটের কাছাকাছি হলেও ভীষণ রোগা বলে আরও বেশি লম্বা মনে হয় তাঁকে। কুস্তি, লাঠি খেলা, বন্দুক ছোড়ায় ভীষণ পটু। তাঁর হাতে শক্ত বাঁশের লাঠি। লাঠির একপ্রান্তে আটকানো লোহার ফলা 'চৌকিশর', দেখতে পাঞ্জার মতো। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, "কোথায় যাচ্ছ কানাইলাল?" তৎক্ষণাৎ কানাইলালের সপ্রতিভ উত্তর, "বেশি দূর নয়, এই একটু মাছ শিকারে নদীর ধারে যাচ্ছি।"

হুগলি নদীতে জোয়ার এসেছে। জোয়ার এসেছে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মনে। সে জোয়ার বিপ্লবের। স্বপ্নের। স্বাধীনতার। দেশ স্বাধীন হবে। বিদেশি শাসক ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে। ছোটরাও স্কুল-কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে বা পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বিপ্লবীদের কাজে সাহায্য করছে। জোয়ারের জল নদীর পাড় পেরিয়ে কিছুটা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওরা দু'জন হাঁটুসমান জল ভেঙে হাজির হল ছোট একটা বাঁশের বেড়া দেওয়া খোড়ো ঘরের সামনে। এই অঞ্চলটার চারদিকে বিস্তর গাছপালা। ঝোপঝাড়। মাঝে-মাঝে জলাজমি। জ্বালানির কাঠ সংগ্রহের জন্য মাঝে-মাঝে লোকজন এদিকে আসে। তা ছাড়া কয়েকটি ধীবর পরিবার নদীর চরে বাস করে। তাই নির্জন এই জায়গাটিকে বিপ্লবীরা গোপন আলোচনা ও গুপ্ত শিবিরের উপযুক্ত জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছেন, ধীবরদের ছোট্ট বাড়ির সামনে পাহারা দিচ্ছেন জনাতিনেক যুবক। প্রত্যেকের কাছে গুলিভর্তি পিস্তল। তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি, অপরিচিত কোনও মুখ দেখলেই গোপন আস্তানায় খবর দেওয়া। ঘরের পেছনে ঝোপের কাছে রাখা আছে সাইকেল ও বাঁশের রনপা। দরকার হলে তাতে চেপে দ্রুত পৌঁছে যেতে পারবেন গন্তব্যে। ব্রিটিশের কিছু চরও এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিয়ে বকশিশ পাওয়ার জন্য। তাই এই সতর্কতা।

কানাইলাল ও বঙ্গভূষণ ঘরে ঢুকতেই উপস্থিত সকলে খুব চাপাগলায় বলে উঠলেন, "বন্দে মাতরম।" সকলে নিশ্চুপ, পরবর্তী কর্মসূচি শোনার জন্য ব্যগ্র। ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর খড় পাতা। কানাইলাল ও বঙ্গভূষণ খড়ের ওপর বসলেন। বঙ্গভূষণ বলল, "কানাইদা, পরবর্তী কর্মসূচি সকলকে জানিয়ে দিন।"

কানাইলাল উঠে দাঁড়ালেন। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলেন দূরের দিকে নদীর বুকে ভেসে থাকা উত্তরে বয়ার ও দক্ষিণের লাইট হাউসের আলো যেন বলছে, অন্ধকার দুর্গম পথে পাড়ি

দিতে হলে ক্ষীণ আলোই যথেষ্ট। কানাইলালের চোখ লাল হয়ে আসে উত্তেজনায়। তিনি বলতে শুরু করেন, "যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা করছি, এই অঞ্চলের নাম গুপ্তগড় বা গুমগড়। একসময় নন্দীগোপাল চৌধুরী ছিলেন এখানের ভূস্বামী। জনহিতকর কাজের জন্য তাঁর ভীষণ সুনাম ছিল। তাঁর নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম রাখা হয় নন্দিগ্রাম। তাঁর পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ যখন নন্দিগ্রামের জমিদার তখন এই গুমগড় বা গুপ্তগড়ে মরাঠা বা বর্গিরা জোর করে চৌথ বা ভূমিরাজস্ব আদায় করত, না দিলে ঘরবাড়ি লুটপাট,এমনকী খুন করতেও দ্বিধা করত না। সেই অত্যাচারের কাহিনী ছড়ার মাধ্যমে মানুষের মুখে মুখে আজও ছড়িয়ে আছে—'ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গি এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে!' কৃষ্ণপ্রসাদ এই অঞ্চলের মানুষের সাহায্যে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলেন এবং নিজে রণতরী নিয়ে বর্গিদের বাধা দিতে বেরিয়ে পড়েন। একদিন বর্গি আক্রমণ শেষ হয়। স্বস্তি ফিরে আসে মানুষের মনে। আবার দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে ইংরেজরা এদেশের শাসক হয়ে এলে। আমাদের সংগ্রাম দেশকে স্বাধীন করা। আমাদের শপথ, শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন, আমাদের প্রত্যেকের ধমণীতে বইছে বীরের রক্ত, আমরা তাই কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য তৈরি।"

মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি, দ্বারিকনাথ চুপচাপ বসে ছিলেন ঘরের এক কোণে। তিনি স্থানীয় জমিদারের লেঠেল। তিনি হাঁটুর ওপরে পরেছেন খদ্দরের ধুতি, কোমরে গামছা শক্ত করে বাঁধা, খালি গা, খালি পা, বিশাল ভুঁড়ি। দ্বারিকনাথ উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কানাইলাল তাঁকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, "আমি বলছি দ্বারিককাকা, বিদেশি শক্তির একদিন পরাজয় হবেই।"

বঙ্গভূষণ সবদিক ভাল করে দেখে নেয়। শান্ত গলায় বলে, "তমলুক মহিষাদল অঞ্চলে আমাদের বিদ্যুৎবাহিনী অত্যন্ত সক্রিয়। আট তারিখে রূপনারায়ণের তীরে শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। জনগণ টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের তার কেটে রাস্তার ওপর বড় বড় গাছের গুঁড়ি রেখে, কোথাও রাস্তা কেটে দিয়ে বড় বড় খাদ তৈরি করে সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যাতে পুলিশ নানা জায়গায় পৌঁছে জনগণের ওপর অত্যাচার না করতে পারে। কাল ঊনত্রিশ তারিখ। পাঁশকুড়া, সুতাহাটা, বালুঘাটা, কুকড়াহাটি, নন্দকুমার, নরঘাটের সঙ্গে সবরকম যোগাযোগ ছিন্ন করা হবে।"

এক কিশোর মাথার থেকে বাঁশের ঝুড়ি নামিয়ে রাখল দরজার সামনে। ঝুড়িতে ইলিশ, ভেটকি, চিংড়ি, নানা ধরনের মাছ। বঙ্গভূষণের চোখের ইঙ্গিতে ঘরে ঢুকল কিশোর। সকলের দৃষ্টি তার দিকে। বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরে

সুতো দিয়ে বাঁধা তাবিজটাকে সে ধীরে-ধীরে হাত থেকে খুলে ফেলল। তারপর জ্বলন্ত হ্যারিকেনের উত্তপ্ত কাচের সংস্পর্শে আনে তাবিজটাকে। তাবিজের সামনের অংশ গালা দিয়ে আটকানো। উত্তপ্ত হতেই গালা গলে গেল, সে তাবিজের ভেতর থেকে একটুকরো কাগজ বের করে কানাইলালের হাতে দিল। কানাইলাল গভীর আগ্রহে কাগজের লেখা পড়লেন। অন্য এক টুকরো কাগজে কী যেন লিখে ওই কিশোরের হাতে দিলে সে আবার তাবিজের মধ্যে কাগজ ভরে সেটা হাতে পরে নেয়। ঘরের বাইরে এসে মাছের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে সে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বঙ্গভূষণ বলে, "আপনারা তৈরি থাকুন ত্রিশ তারিখের জন্য। রাত অনেক। সকলে শিবিরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম করুন।"

মুহূর্তের মধ্যে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। বাইরে পাহারারত এক যুবক দ্রুত ঘরে ঢুকে বলল, "ঘরের পেছনে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের গুপ্তচর মনে হচ্ছে।"

বঙ্গভূষণ খাপ থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে ট্রিগারে আঙুল রাখল। কানাইলাল বললেন, "অ্যাকশন!"

রক্ষীরা দুই কিশোর-কিশোরীকে ধাক্কা মেরে ঠেলতে ঠেলতে জোর করে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। কিশোর বলল, "আমি স্পাই নই। আমাকে মারবেন না।" সে বঙ্গভূষণ ও কানাইলালের দিকে দু'হাত জড়ো করে অনুনয়ের সুরে বলে, "আঙ্কল, আমার বাবার নাম কুল্লাউ। আমার নাম ওলগান।"

"তুমি কুল্লাউর ছেলে!" কানাইলালের মুখের গাম্ভীর্য মুহূর্তে মিলিয়ে যায়।

ওলগান বলে, "হ্যাঁ,আমার সঙ্গে বারজান আঙ্কলের মেয়ে আকতান।"

বঙ্গভূষণ খাপে পিস্তল ভরতে ভরতে বলে, "তোমাদের আগে দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।"

লম্বা শরীর। মাথায় খয়েরি রঙের চুল, চোখের তারা লালচে, দুধে-আলতায় গোলা শরীর ওলগানের। আকতানের মুখে সর্বদা হাসির রেখা। টানা টানা চোখ, সুন্দর মুখশ্রী। সে বলল, "শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষ পর্তুগালের বাসিন্দা ছিল। তারা দস্যুবৃত্তি করতে এসে এখানে থেকে যায়। আমাদের জন্ম এদেশে। এদেশের মাটির সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক। ভারত আমার মা। আমরা কি আপনাদের কোনও কাজে সাহায্য করতে পারি না?"

ওলগান বলে, "আঙ্কল, আমি খুব কম বয়স থেকে কলকাতায় এক সাহেবের হোটেলে কাজ করতাম। আমার পিঠে দেখুন ওদের অত্যাচারের চিহ্ন।"

ওলগানের পিঠে চাবুকের দাগ দেখে বঙ্গভূষণ ও কানাইলাল উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

আকতান বলে "তাই ওলগানদা বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়ে বাড়িতে চলে এসেছে। ওর ইচ্ছে বাবার সঙ্গে মাছের ব্যবসা করা।"

কানাইলাল ওলগানকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, "ভাই, তোমরাই তো আমাদের শক্তি। তোমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তোমাদের একটি কঠিন কাজের দায়িত্ব দেব। পারবে করতে?"

ওলগান কী বলবে ভাবছে, এমন সময় আকতান বল, " কী কাজ কাকু?"

"তোমার ওপর যা দায়িত্ব দেওয়া হবে তা পালন করতে পারবে তো?" বঙ্গভূষণের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে।

"আমার ক্ষমতার মধ্যে হলে প্রাণ দিয়েও চেষ্টা করব পালন করতে।" বলে ওলগান।

"তোমাদের যথাসময়ে সব বলব। এখন তোমরা বিশ্রাম করো।" বললেন কানাইলাল।

ভোরের আলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। গাছপালা, নদী যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে শরীরে জড়ানো কালো চাদরটাকে। আজ আকাশটা যেন বেশি লাল। ওলগান ভেতরে ভেতরে দৃপ্ত হয়ে ওঠে। বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা করা শহিদের বুকের রক্তের স্রোত নয় তো! একবার সে কলকাতার বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিশাল মিছিল যেতে দেখেছে। সকলের হাতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। তারা পতাকা উঁচুতে তুলে বলছে, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে,' 'ইংরেজ, তুমি ভারত ছাড়ো'। আবার সে কোনও এক বন্ধুর কাছে শুনেছে, কোনও নেতা নাকি বলেছেন, 'আমাকে রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দেব।'

নদীর বুকে জাহাজের চিমনির ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে এঁকে দিচ্ছে বিশাল জিজ্ঞাসাচিহ্ন। কিছু সময় পরে ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে ওলগানের মনে হচ্ছে, জিজ্ঞাসাচিহ্ন নয়, একটা খড়্গ। তা হলে কি সত্যি অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে! বাপুজি নামে কোনও এক নেতা নাকি বলেছেন, অহিংস পথে সংগ্রাম করতে। হাজার প্রশ্ন ওলগানের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। সে পেছন ফিরে দেখে আকতান আসছে হাঁটতে হাঁটতে আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে, ওর দিকে। একটা জাহাজ চলে যাচ্ছে খেজুরি পেরিয়ে দক্ষিণে হিজলির দিকে।

ওলগান একবার ওখানে গিয়েছিল। ভীষণ ভাল লেগেছিল ওর জায়গাটা। একটার পর একটা বালিয়াড়ি, বাদাম, ঝাউবন, কোথাও-বা জুন ঘাসের কার্পেট পাতা। কত রঙিন পাখি মেলা বসিয়েছে নদীর চরে। ওই সময় আকতান অসুস্থ, সবাই বলছে সে আর বাঁচবে না। যখন-তখন কাঁপুনির সঙ্গে জ্বর আসে, ওর চোখের কোণে কালি জমে গেছে। ফরসা মুখটাকে ফ্যাকাসে লাগছে। বিছানা থেকে উঠে বসতে ভীষণ কষ্ট হয় তার, হাঁপিয়ে যায়। ওলগান হঠাৎ কলকাতা থেকে সেবার বাড়ি এসেছিল। আকতানের অসুখের কথা শুনে তার বাড়িতে গিয়েছিল। ওলগান বিছানার পাশে বসে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আকতানের মুখের দিকে। ওলগানকে দেখে আকতানের চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে কোনও কথা বলতে পারেনি। আকতানের মা বলেছিলেন, "আকতান তোমার কথা বারবার বলছিল। ওর আর কোনও ভাই-বোন নেই। তোমাকে নিজের দাদা মনে করে। তুমি হঠাৎ এসে খুব ভাল করেছ বাবা।"

আকতান ধীরে-ধীরে ক্ষীণ গলায় বলে, "ওলগানদা, আর বাঁচব না। কতবার চোর-পুলিশ, কানামাছি খেলতে গিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি। পাকা তাল কুড়োতে গিয়ে মারামারি করেছি। সব ভুলে যাও দাদা! যখন জ্বর আসে কিছুই ভাল লাগে না।"

ওলগান কান্নায় ভেঙে পড়ে। কোনও উত্তর দিতে পারেনি। কে যেন তার গলা চেপে ধরে। সে শুনেছে, হিজলিতে আছেন এক ফকির। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। ওলগান ছোটে তাঁর কাছে।

বিকেলের ছায়া নেমে এসেছে নদীর বুকে নদীর চরের বকুলগাছের নীচে। ওলগান আকতানের বাড়ি পৌঁছেই হতবাক! আকতান দাওয়ায় খেজুরপাটি পেতে তার ওপর বসে আছে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে। সে একমনে কী যেন চিন্তা করছে। ওলগান বলল, "মনে হচ্ছে জ্বর কমে গেছে তোমার?"

আকতান ওলগানের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ গলায় বলে, "তুমি সত্যি আমাকে ভালবাস ওলগানদাদা। আমাকে কোত্থেকে এনে দিলে এমন অদ্ভুত ওষুধ, একটু খেতেই কাজ। দুপুরের পরে আর জ্বর আসেনি। এখন শরীরটা ভাল লাগছে। কাঁপুনি নেই।" আকতানের মুখে খুশির আলো।

ওলগান বলে, "ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল, যদি না সারে! যাক, এখন তুমি সেরে উঠেছ, সবই সেই আশ্চর্য মানুষটির দয়া।"

"কোন মানুষের কথা বলছ ওলগানদাদা?"

"সে-কথা থাক। তোমার কষ্ট হলে আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় আকতান।"

ওরা দু'জন ঘর থেকে বেরিয়ে বকুল গাছের নীচে গিয়ে বসল। নদী বয়ে চলেছে কলকল শব্দে। এ চলার যেন শেষ নেই, বিরাম নেই। আকতান দু'হাত ভরে কুড়োল ফুলগুলো। বকুল গাছের ডাল থেকে সুতোর মতো ঝুলে থাকা, গোলঞ্চ লতা দিয়ে সে গাঁথল ফুলের মালা। সেই মালা ওলগানের ডান হাতে জড়িয়ে দিয়ে বলল, "ভাইয়ের হাতে পরাই রাখি, সব বিপদকে দিলাম ফাঁকি।"

ওলগানের মুখ হঠাৎ যেন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে বলে, "মানে!"

"আজ যে রাখিবন্ধন উৎসব, জানো না?"

ওলগান যেন কোনও স্বপ্নরাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভুলে গিয়েছিল রাস্তায় সে হাঁটছে। সে দেখে তার কাছাকাছি চলে এসেছে আকতান। সে আকতানের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "দারুণ মানিয়েছে তোমাকে।"

"তোমাকেই বা কম কী!" বলে আকতান।

ওলগান এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে কাছাকাছি কেউ আছে কি না। তারপর খুব চাপা গলায় বলে, "এখন থেকে তোমার নাম মিস এমিলি।"

আকতান হাসতে হাসতে বলে, "আর তোমার নাম ডেভিড। আমাদের কাজ নন্দিগ্রাম থানার দারোগার সঙ্গে যেমন করে হোক দেখা করে জেনে নেওয়া বিপ্লবী দমনে কেমন প্রস্তুতি নিচ্ছেন।"

চারদিকে ছোট ছোট চালাঘর। নন্দিগ্রাম বাজার। কাছেই জানকীনাথের মন্দির। সঙ্কীর্ণ গলিপথ পেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলে থানা। ওলগান ও আকতান দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের প্রধান তোরণের সামনে। মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য ভক্তদের ভিড়। একজন হাবিলদার মন্দিরের সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ওলগান ও আকতানের দেখে ওদের সাহেব ও মেমসাহেব ভেবে রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

ওলগান বলে, "হ্যালো হাবিলদার সাহেব। গুড মর্নিং।" হাবিলদার তাড়াতাড়ি স্যালুটের ভঙ্গিতে বলে, "সেলাম সাহেব।"

ওলগান গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, "শোনো হাবিলদার, নেটিভ ইন্ডিয়ান আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। আমার নাম ডেভিড, আর এ আমার সিস্টার মিস এমিলি। আমরা বিপ্লবীদের উচিত শিক্ষা দিতে চাই।"

হাবিলদার মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, "সাহেব, আপনি ঠিক বলেছেন। ব্যাটাদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আপনারা থানায় চলুন দারোগাবাবু আপনাদের সাহায্য করবেন।"

দারোগা তাঁর অফিসঘরে চেয়ারে বসে আছেন। সামনে টেবিলের ওপর তাঁর সার্ভিস রিভলভার। হাবিলদার দরজার সামনে এসে স্যালুট ঠুকে বলে, "সার, দু'জন সাহেব মেমসাহেব এসেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে।"

দারোগা ব্রজগোপাল ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি দ্রুত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলেন, "সাহেব, মেমসাহেব! কোথায়?"

হাবিলদার দারোগার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, তিনি খুশি হননি সাহেব মেমসাহেবকে থানার গেটের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখায়।

দারোগা উত্তেজিত হয়ে বলেন, "বেকুব, সাহেবদের কীভাবে সম্মান দেখাতে হয় জানো না! তাড়াতাড়ি এখানে ডেকে আনো।" তারপর নিজেই চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে এগিয়ে এসে বিগলিত হয়ে বললেন, "ভেতরে আসুন।"

তারপর ডেভিড অর্থাৎ ওলগানের কাছে সব শুনে বললেন, "আপনি ঠিক বলেছেন সাহেব। ওইসব নেটিভরা রেভেলিউশনিস্ট। ওদের মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নেই। ইংরেজ সরকার বাহাদুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে পারবে লড়াই করতে? সুযোগ পেলে আমি ওদের খতম করে দিই। দয়ামায়া ওসব আমার শরীরে নেই। সাহেব, আপনি থাকেন কোথায়?"

এমিলি অর্থাৎ আকতান বলে, "আমার বাবা খেজুরি সমুদ্র সৈকতে নুনের ফ্যাক্টরি করবেন। সেজন্য ওখানে জমিও কিনেছেন। আমরা..."

আকতানের কথা শেষ হতে-না-হতেই ওলগান বলে, "আমরা শুনেছি নন্দিগ্রাম মার্কেট বিজনেস সেন্টার আছে। আমরা মার্কেট সার্ভে করতে এসেছি।"

দারোগা কাউকে আক্রমণের ভঙ্গিতে রিভলভার ডান হাতে নিয়ে উঁচুতে তুলে ধরে উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, "সরি, ভেরি সরি, এক্সট্রিমলি সরি। শয়তানরা আপনাদের অপমান করেছে। সুযোগ পেলে দেখিয়ে দেব, সাহেবদের

অপমান করলে কেমন শাস্তি পেতে হয়। আমার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ। কোনওদিন ফায়ার মিস হয়নি।"

আকতান ও ওলগান দারোগার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে চমকে ওঠে। ওলগান বলে, "থ্যাঙ্ক ইউ সার। আমরা যাচ্ছি।"

বিপ্লবী দলের গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে আছে কিশোর পুলিনবিহারী। সে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। থানা আক্রমণের আগের দিন অর্থাৎ উনত্রিশে সেপ্টেম্বর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। সূর্য ডুবু ডুবু। পশ্চিম আকাশ লালে লাল। পুলিনবিহারী গোপনে খবর আনল, জনতা থানা আক্রমণের জন্য তৈরি। একদল ক্ষিপ্ত স্বেচ্ছাসেবক কিছুক্ষণ আগে নন্দিগ্রামের বিভিন্ন অফিস দখল করেছে। জনতা পোস্ট অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এবং ব্রিটিশের চাটুকার পোস্টমাস্টারকে জোর করে ধরে নিয়ে বন্দে মাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করিয়েছে। পিংলা থানাও আজ দখল হয়ে গেছে। কাল দখল করেছে বিপ্লবীরা সুতাহাটা থানা। সেখানের থানা অফিসাররা চারটি বন্দুক ও দুশোটি কার্তুজ বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। হিজলি টাইডেল ক্যানাল সংলগ্ন ডাকবাংলো অফিস ভাঙচুর হয়েছে এবং নন্দিগ্রাম যাওয়ার একমাত্র কাঁচা সড়ক ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সমস্ত কাঠের পুল ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

ভোর হতে বেশি দেরি নেই। ওলগানের চোখে সারারাত্রি কিছুতেই ঘুম আসেনি। সে শুয়ে আছে স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্পে খড়ের ওপর পাতলা চাদর পাতা বিছানায়। দু-একটা কুবো পাখির শব্দ মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসছে। ওলগানের মনে হচ্ছে যেন গুলির শব্দ। সংগ্রাম পরিষদের নায়ক কানাইলাল বলেছেন, ভোর হলে যে দিনটি জেগে উঠবে সেই দিনটি নন্দিগ্রামের ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন হিসেবে চিহ্নিত হবে। কারণ, এই ত্রিশে সেপ্টেম্বর থানা দখল করে জয়ের পতাকা ওড়ানো হবে। ব্রিটিশকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে, আমরাও বীরের জাত। থানায় যে সামান্য পুলিশ আছে ওরা হাজার হাজার জনতাকে এগিয়ে আসতে দেখলে ভয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। আবার, যখন দারোগার মিশকালো দৈত্যের মতো বিশাল খর্বাকৃতি মুখ, হিংস্র দাঁতের ফাঁকে বীভৎস হাসির শব্দ, পিস্তল হাতে গর্জে ওঠা মনে পড়ে তখন একটু সংশয় জাগে বইকী! গোপনে খবর সংগ্রহের জন্য ওলগান নকল ব্রিটিশ সাহেব সেজে যখন থানায় গিয়েছিল তখন দারোগাকে খুশি করার জন্য তাকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করেছিল। তাকে বলেছিল 'টাইগার'। যতই ভাবছে ততই দারোগার ছবিটা যেন জীবন্ত নেকড়ের মতো তার সামনে ভেসে উঠছে। তার চোখের দৃষ্টি বন্দুকের গুলির চেয়েও যেন ধারালো।

শরতের নীল আকাশ। সকাল হয়ে গেছে। আজকের আকাশটাকে যেন থমথমে মনে হচ্ছে ওলগানের। যেখানে-সেখানে লাল লাল রক্ত যেন ছড়ানো। দূরের কুয়াশা-ঢাকা গাছপালা ঝোপঝাড় অস্পষ্ট লাগে ওলগানের চোখে। চারদিকে যুদ্ধের পরিবেশ। মিছিলে মিছিলে ভরে যাবে নন্দিগ্রাম বাজার, জানকীনাথের মন্দিরের সামনের চওড়া রাস্তা, থানা, পুকুরপাড়। তারপর সকলে এগিয়ে যাবে থানার দিকে। থানা দখল করে উড়িয়ে দেবে জাতীয় পতাকা। সকলে একসঙ্গে বলবে "বন্দে মাতরম'।

ওলগান মনে মনে ঠিক করে, সে আকতানের সঙ্গে আজ দেখা করবে না। আকতান সেবা ক্যাম্পে নাম লিখিয়েছে। কাল থেকে সে সেবা ক্যাম্পে আছে। কোনও এক স্বেচ্ছাসেবকের হাতে ছোট একটুকরো কাগজে লিখে একটা চিঠি পাঠিয়ে দেয় আকতানকে দেওয়ার জন্য। তাতে লেখা, "বোনের পরিয়ে দেওয়া বকুল ফুলের রাখি আমার হাতকে আরও শক্ত করেছে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই হাত দিয়ে লড়াই করতে আমি যাচ্ছি দেশমায়ের আশীর্বাদ ও তোমার মতো বোনের শুভেচ্ছা নিয়ে নন্দিগ্রাম থানা দখলে। যদি ফিরে আসি আবার দেখা হবে। ইতি—দাদা ওলগান।"

রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে গাছপালা, অরণ্যে, নদীর বুকে। সেবা ক্যাম্পের সকলের মুখে হতাশার কালো ছায়া। খবর এসেছে উত্তেজিত জনতা টিনকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এগিয়ে চলেছে সরু আঁকাবাঁকা পথ ধরে নন্দিগ্রাম থানার দিকে। কম করে কুড়ি হাজার জনতার ভারতমাতা কি জয়, বন্দে মাতরম ধ্বনিতে নন্দিগ্রাম থানা তখন ভয়ে কাঁপছে। মিছিলে প্রত্যেকের হাতে জাতীয় পতাকা, মোটাসোটা লাঠি, কুড়ুল, কাস্তে, হাঁসুয়া, শাবল ইত্যাদি। থানার গেটের সামনে জনতার ঢেউ আছড়ে পড়তেই দারোগার হিংস্র দানবের রূপ দেখে অনেকে শিউরে ওঠে। তিনি আদেশ দেন, "ফায়ার!" ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বিষাক্ত সাপের ছোবলের মতো আঘাত করে জনতাকে। জনতা দৃপ্ত কণ্ঠে গর্জে ওঠে, "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!" বীর বিপ্লবীদের রক্তে থানার সামনের রাস্তা লাল হয়ে গেছে। তবুও সবাই এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা থানার সামনে জাতীয় পতাকা ওড়াতে পারেননি। থানার সামনের সরু রাস্তাই বিপ্লবীদের একসঙ্গে থানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় বাধার সৃষ্টি করে। তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য হন। কয়েকজন সংগ্রামী মারা গেছেন, তার মধ্যে একজন কিশোরও। যাঁরা মারা গেছেন বা আহত হয়েছেন তাঁদের নাম এখনও জানা যায়নি।

রাত্রি আরও বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে উৎকণ্ঠা। অন্ধকার যেন গাঢ় থেকে হচ্ছে গাঢ়তর। আকাশের তারাগুলো নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেবা ক্যাম্পের দিকে। আকতান ক্যাম্পের বাইরের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকায় ওপরের দিকে একপলক। ঝাপসা হয়ে আসে তার চোখের দৃষ্টি। সে শুনতে পায়, কাছের অর্জুন গাছ থেকে ভেসে আসা কোনও রাতজাগা পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ। তার চোখে পড়ে হুগলি নদীর বুকে উত্তাল ঢেউ আর ঢেউয়ের মাথায় জেগে ওঠা ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের মতো আগুনের ফুলকি। গাছের পাতায় জমে ওঠা শিশিরবিন্দু ফোঁটা-ফোঁটা চোখের জলের মতো মাঝে-মাঝে গড়িয়ে পড়ছে।

একটা ডিঙি নৌকো দাঁড় টানা বন্ধ করে থামল সেবা ক্যাম্পের কাছে নদীর তীরে। অস্পষ্ট অন্ধকারে কয়েকজন নামল নৌকো থেকে। তারা ধরাধরি করে পরপর কয়েকজনকে নামিয়ে আনল নদীর চরে। তারপর তাদের নিয়ে এল সেবা ক্যাম্পের দিকে। সেবা ক্যাম্পে ওষুধ,ডাক্তারের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা আছে। বাঁশের স্ট্রেচারে শোয়ানো একজনকে কাছে আসতেই আকতান আর কান্না চেপে রাখতে পারেনি। এ যে ওলগান। তার খদ্দরের জামা আর ধুতির এখানে সেখানে চাপ চাপ রক্ত। মুখে হাসি নেই, শুধু হতাশার গাঢ় ছায়া। আকতানকে দেখে ওলগান কান্নাজড়ানো গলায় বলে, "পারলাম না নন্দিগ্রাম থানায় পতাকা ওড়াতে। আমার চোখের সামনে বিহারীলালের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য!"

"তোমার ডান হাতের কুনুইয়ের কাছ থেকে যে রক্ত ঝরছে," বলে আকতান।

ওলগান ম্লান হেসে বলে, "ও কিছুই নয়। একটুর জন্যে...।" আকতান একটুকরো সাদা কাপড় ওলগানের আহত হাতের ক্ষতের ওপর বেঁধে দিয়ে বলে, "এ পরাজয় নয় দাদা! হার না মানা হার!"

একজন স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে এসে বলে, "যাদের আঘাত গুরুতর তাদের অন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওলগানের ডান হাতে গুলি লেগেছে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলাম— কিন্তু রাজি হল না। সেবা ক্যাম্পে চলে আসতে চাইল। তাই বাধ্য হয়ে এখানে আনলাম ওকে।"

ওলগানকে শোয়ানো হয়েছে কাঠের চৌকির ওপর পাতা বিছানায়। সে ধীরে-ধীরে বলল, "আকতান, এই হাত দিয়ে আবার আমি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়ব। পারব তো?"

আকতান চোখের জল তার শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বলে, "তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে দাদা। তোমার এই হাতে বকুল ফুলের রাখি পরিয়ে দেব। তুমি আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে স্বাধীনতার যুদ্ধে। উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে তিরিশ তারিখের এই থানা আক্রমণ বিপ্লবীদের নতুন করে পথ দেখাবে। তোমাদের আদর্শ, তোমাদের ত্যাগ কখনও মিথ্যে হবে না।"

ওলগানের চোখের কোণে দু'ফোটা জল চিক চিক করছে। মুখে কষ্টের ম্লান হাসি। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত কোনওরকমে শূন্যে তুলে ধরল সে। এর মানে পারব, পারতেই হবে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সুযোগ পেলেই এখনও পড়ি বনজঙ্গলের গল্প

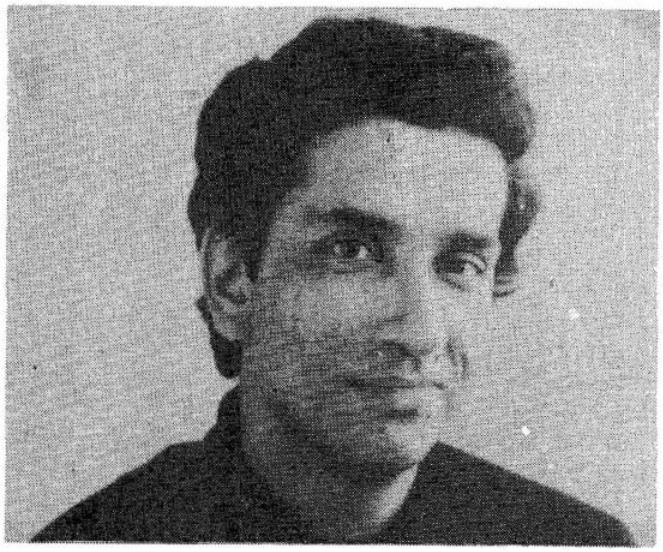

সব্যসাচী চক্রবর্তী

ছেলেবেলায় যেসব বই আমাকে খুব টানত সেই 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'হ-য-ব-র-ল', 'আবোল তাবোল' তো বহু শিশুকেই টানে। কিন্তু যে বই ছেলেবেলায় পড়ে ভাল লাগেনি, বড় হয়ে পড়ে কিন্তু দারুণ ভাল লাগল, সেই বইটার নাম 'জঙ্গল'। এই বইটা লিখেছিলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। ইনি একজন শিকারি ছিলেন। বইটা ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বইটার মধ্যে হাস্যরস যেমন আছে, শ্লেষও তেমনই আছে। ছেলেবেলায় পড়ে সেসব তেমন বুঝতে পারিনি। বড় হয়ে পড়ার সময় তার প্রকৃত রস আস্বাদন করতে পেরেছি। লেখার সময় ভদ্রলোক নিজেকে নিয়ে যেমন মজা করেছেন, তেমনই নিজের স্ত্রীকে নিয়ে লিখেছেন, শ্যালককে নিয়ে লিখেছেন। তা ছাড়া সমাজব্যবস্থাকে নিয়ে তো লিখেইছেন, লিখেছেন প্রশাসনকে নিয়েও। আর বইটার মূল উপজীব্য তো জঙ্গল আর জীবজন্তু। শুরুতেই নিজেকে অন্য চোখে দেখে দেবীপ্রসাদবাবু লিখেছেন 'পোষা হাজব্যান্ডের শিকারকাহিনী', তারপর শ্যালককে নিয়ে মজা করেছেন 'শিকারে রাজসংসর্গ'-এ। তারপরের পরিচ্ছেদগুলোর নাম 'গভীর অরণ্যে একটি রাত্রি', 'রহস্য', 'বনচারিণী', 'বাঘে মানুষে'। উনি একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। মানুষখেকো বাঘের সন্ধান পেলেই উনি শিকারি এবং লোকজন নিয়ে সেখানে পৌঁছে যেতেন। তখন তো যাতায়াতের এত সুবিধে ছিল না। ট্রেনে করে যতটা সম্ভব গিয়ে তারপর গোরুর গাড়ি করে বা পায়ে হেঁটে বাকি পথটা যেতেন। মানে উনি মানুষখেকো বাঘ খুঁজে বেড়াতেন আর কি। ওঁর এই বাঘখোঁজার মধ্যে বেশ একটা রোমহর্ষক ব্যাপার ছিল। এইসব ঘটনা বিভিন্ন সময়ে আমি আমার ছেলেদেরও শুনিয়েছি, ওরা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছে আমার বলা গল্প। ইদানীং তো আর ইকনমিক্স, ফিলজফি বা সাইকোলজি নিয়ে পড়ার সুযোগ পাই না। যা পড়ি তা ওই জঙ্গল নিয়েই ।

কিছুদিন আগে যে বই আমার ভাল লেগেছিল তা রবার্ট রুডলাম আর জেফ্রি আর্চার। ট্রেনে যেতে যেতে এইসব বই-ই পড়া হয়। আর তাকিয়ে থাকি বইমেলার দিকে। সেখান থেকে কিছু ভাল বাংলা বই কেনা হয়। সম্প্রতি উপহার পেলাম আমার দারুণ প্রিয় বই, 'ব্যোমকেশ সমগ্র'। আর যে ব্যাপারে আমার নিজেরই ভীষণ আগ্রহ সেই ফোটোগ্রাফির ওপর কিছু বই-টই কিনি, ওয়াইল্ড লাইফের ওপরও বইপত্তর কিনি। তবে মজার কথা হল, এখনও পর্যন্ত জিম করবেটটাই কেনা হয়নি।

কিশোর বয়স থেকে অনেকের মতো আমারও প্রিয় ফেলুদা আর প্রোফেসর শঙ্কু। বড় হয়ে সেই ফেলুদার চরিত্রটাই তো সন্দীপ রায়ের কাছ থেকে 'দিন না, দিন না, দিন না' করে একরকম কেড়ে নিয়েছি। ফেলুদার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ না থাকলে এটা তো হত না। আর এটা তৈরি হয়েছিল বই পড়েই। কারণ ফেলুদা হিসেবে নির্বাচনের পরে সন্দীপ রায় আমায় বারণ করে দিয়েছিলেন, 'বাবার করা কোনও ফেলুদার ছবি দেখবে না, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে কপি করার চেষ্টা করবে না।' আমি সৌমিত্রদার দিকে যাওয়ার চেষ্টাই করিনি, কারণ জানতাম পারব না। তা ছাড়া ওঁকে কপি করলে হয় লোকে বলবে ব্যাড কপি, নয় বলবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো হয়নি। তাই আমি আমার মতো করে করতেই চেষ্টা করেছি। আর সেটা সম্ভব হয়েছে ফেলুদা পড়েই, গল্পের ফেলুদা আমার মধ্যে ভীষণভাবে ছিল বলেই। যখন ঠিকমতো পড়তে শিখলাম তখন দেখলাম শার্লক হোম্‌স, ব্যোমকেশ, ফেলুদা একটা অন্য ক্যাটাগরিতে চলে আসে। বাদবাকি যারা আছে তাদের অধিকাংশকেই অত্যন্ত ছেলেমানুষি বলে মনে হতে লাগল। যেমন ধরুন, কোনও গোয়েন্দাকে যখন দেখতাম একহাতে পিস্তল, একহাতে বন্দুক নিয়ে আর একহাতে দড়ি ধরে পাঁচিল বেয়ে উঠতে, তখন মনে হত তৃতীয় হাতটা এল কোথা থেকে!

অনুলিখন : অরুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণুচরণ ঘোষের আখড়ায় আজও চলে স্বাস্থ্য গড়ার সাধনা

'ব্যায়ামাচার্য' বিষ্ণুচরণ ঘোষ একই সঙ্গে 'বডি বিল্ডিং' এবং যোগাসনের প্রবর্তন করেন। ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঘোষেস কলেজ'। লিখেছেন অশোক রায়

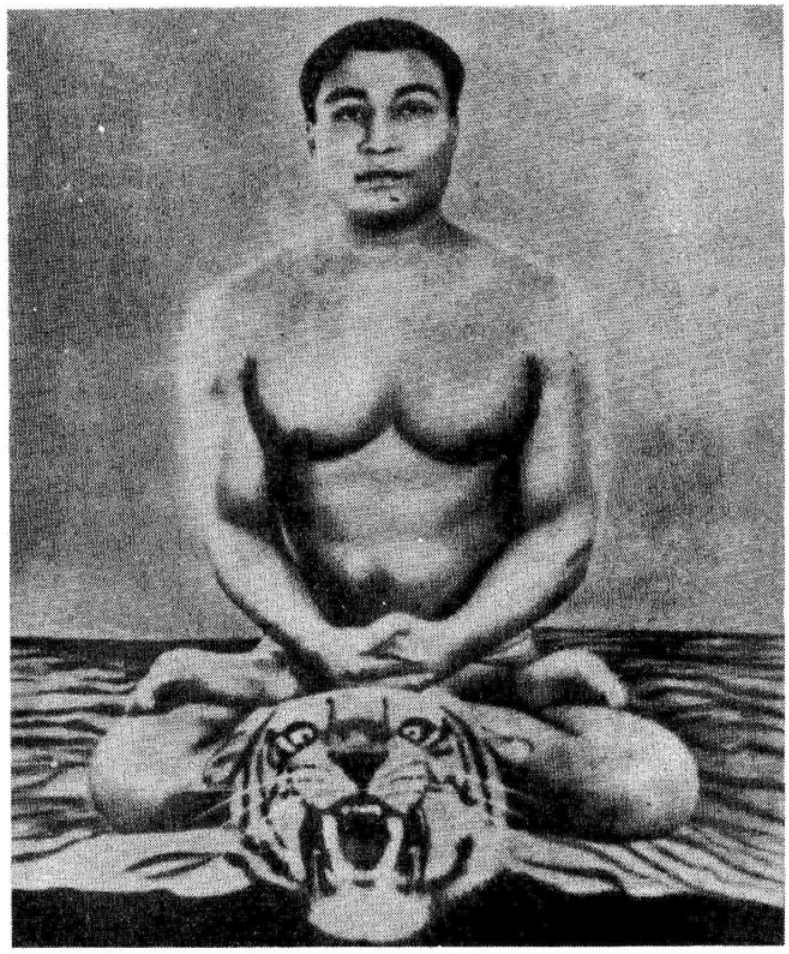

আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরেই চলছিল গাড়িটা। সিটি কলেজের সামনে হঠাৎই ব্রেক কষলেন চালক। দরজা খুলে নামলেন ফুটপাথে। তারপর গাড়ি থেকে ছেলেকেও ডেকে নিয়ে এগোলেন কলেজের দিকে। কলেজের সীমানার রেলিংয়ের মধ্যে একটা সরু ফাঁক দেখিয়ে বয়স্ক ভদ্রলোকটি বললেন, "ওই ছোট্ট ফাঁক গলেই আমি কলেজের ভেতরে ব্যায়াম করতে ঢুকতাম।" বাবার বিশাল বুকের ছাতির দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ছেলে বলে উঠল, "ওইটুকু ফাঁকের মধ্যে দিয়ে তুমি গলতে কী করে?" মৃদু হেসে বাবা বললেন, "তখন আমার বুকের ছাতি ছিল ২৩ ইঞ্চি।" শুধু ২৩ থেকে ৪৮ ইঞ্চি বুকের ছাতি বাড়ানোর জন্যই নয়, ব্যায়ামের প্রতি এই মানুষটির নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, আগ্রহ দেখে সমগ্র বাঙালি, তথা ভারতবাসীর বুকের ছাতি গর্বে বেড়ে যাওয়ারই কথা। মানুষটির নাম 'ব্যায়ামাচার্য' বিষ্ণুচরণ ঘোষ। এখন যদিও চতুর্দিকে ব্যাঙের ছাতার মতো যোগাসনের স্কুল গজিয়ে উঠেছে, কিন্তু এখানে একই সঙ্গে 'বডি বিল্ডিং' এবং যোগাসনের প্রথম প্রবর্তন করেন বিষ্ণুচরণ ঘোষই। ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঘোষেস কলেজ'। মনোতোষ রায় থেকে শুরু করে কমল ভাণ্ডারি, পরিমল রায়, ওঙ্কার ব্যানার্জির মতো বহু 'বিশ্বশ্রী' 'এশিয়াশ্রী' 'ভারতশ্রী' বেরিয়েছে তাঁর হাত দিয়ে।

বিষ্ণুচরণ ঘোষ সম্পর্কে কিছু তথ্য

জন্ম : ২৪ জুন ১৯০৩ সাল।
মৃত্যু : ৭ জুলাই, ১৯৭০ সাল।
গুরু : রাজেন গুহঠাকুরতা।
পিতা : ভগবতীচরণ ঘোষ।
প্রতিষ্ঠা করেন : বিখ্যাত ঘোষেস কলেজ, ১৯২৩ সালে।
১৯৫১ সালে : মিঃ ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় চিফ জাজ হন।
১৯৬৮ সালে : প্রথম জাপান সফরে যান ছ'জনের দল নিয়ে। এখন জাপানেই আছে ৪২টি শাখা।
১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে : রামমোহন মঞ্চের সামনে তাঁর আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়।

ঘোষেস কলেজই ক্রমে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় 'বিষ্টু ঘোষের আখড়া' নামে। এবং তখন থেকেই মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, শুধু ব্যায়ামবীর নয়, বিষ্টু ঘোষের আখড়ায় গড়ে ওঠে প্রাণবন্ত, সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক। স্বাস্থ্য- সাধনার মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলা হয় মানুষও।

অনেকেরই হয়তো জানা নেই, লাহোরে জন্মেছিলেন বলে তাঁর আসল নাম ছিল লাহোরিলাল। এখানে এসে নাম বদলে হন বিষ্ণুচরণ। মাত্র আট মাস বয়সে মাকে হারান বিষ্ণুবাবু। অষ্টম গর্ভের সন্তানকে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মানুষ করেছেন বাবা ভগবতীচরণ (সেইসঙ্গে আদরও দিয়েছেন মাত্রাতিরিক্ত)। রেলে চিফ অ্যাকাউনট্যান্টের কাজ করতেন ভগবতীবাবু। কিন্তু তাঁর ওপরের পদমর্যাদার দুই সাহেব বিলেতে ফিরে যাওয়ায় নিজের কাজ সামলেও ওই দুই উচ্চপদস্থ অফিসারের কাজও নিজের দায়িত্বে নিষ্ঠাভরে করে যান ভগবতীবাবু দীর্ঘ ন'বছর। পরে যখন এই কথা প্রকাশ হয়, তখন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁর এই অবিশ্বাস্য কর্তব্য-নিষ্ঠার মর্যাদা দিতে ওই দুই সাহেবের গত ন'বছরে যা বেতন পাওয়া উচিত ছিল তা ভগবতীবাবুকে এক থোকে প্রদান করেন। সেই যুগে একসঙ্গে ২০-২৫ লক্ষ টাকা পাওয়ার ঘটনা কুবেরের সম্পদ পাওয়ার মতোই বিস্ময়কর। চার ছেলে, চার মেয়েকে সেই সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার ফলে প্রথম জীবনে বিষ্ণুবাবু কয়েকটি মোটরগাড়ি এবং বাইক কেনেন। সদ্য যুবা বিষ্ণুচরণ এত জোরে গাড়ি চালাতেন (শোনা যায় সজোরে ধাক্কা খেয়ে তাঁর কয়েকটি বাইক এমনই দুমড়ে মুচড়ে যেত যে, সেকেন্ড হ্যান্ডেও বিক্রি হত না) যে, পথ-চলতি লোকও ভয়ে সিঁটিয়ে যেতেন। এই খবর পৌঁছে গিয়েছিল স্বয়ং নেতাজির কানেও। একদিন নেতাজি কথাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবুকে বললেন, "শুনলাম তুমি নাকি জোরে গাড়ি চালিয়ে লোকজনদের ভয়টয় দেখাও। তা আমাকে একটু ভয় দেখাবে?" বারাসাতে একটা মিটিং সেরে ফেরার সময় দুষ্টুবুদ্ধি চাপল বিষ্ণুবাবুর। শুরু করলেন প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালানো। কিন্তু পিছনের সিটে-বসা নেতাজি ক্রমাগত বলতে লাগলেন, "কই হে, এই তোমার সেরা স্পিড!" বিষ্ণুবাবু পরে স্বীকার করেছেন, "আমার পক্ষে যতখানি সম্ভব ততটা স্পিডে চালিয়েও ওই মানুষটির মনে যখন সামান্য ভয়ও ধরাতে পারলাম না, তখন বুঝলাম কেন তিনি নেতাজি।"

মনের জোরে নিজেও কম যেতেন না বিষ্ণুচরণ। হাল্‌শিবাগানে কালীপুজোর ভাসানের দিন 'শো' দেখাচ্ছিলেন বিষ্ণুবাবু ও তাঁর দল। হঠাৎই আগুন লাগে প্যান্ডেলে। হোগ্‌লা পাতায় তৈরি প্যান্ডেল থেকে বেরোতে না পেরে মারা যায় প্রায় ৪০০ মানুষ। ওই বিধ্বংসী আগুন রেহাই দেয়নি খেলা দেখানোয় ব্যস্ত-থাকা বিষ্ণুবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণকেও। দুর্ঘটনা সত্ত্বেও পুত্রহারা বিষ্ণুবাবু কিন্তু মোটরবাইকে প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ খেলা দেখানো থেকে কখনও সরে আসতে বলেননি ছোট ছেলে বিশ্বনাথকে।

নিজের ব্যায়াম শিক্ষা অধুনা বাংলাদেশের রাজেন গুহঠাকুরতার কাছে। শারীরচর্চার পাশাপাশি শিখেছিলেন হঠযোগ, ক্রিয়াযোগ, এমনকী বুকে হাতি তোলার (হাতির নাম ছিল 'ইন্দিরা') কৌশলও। নিজে কখনও চা, পান, সিগারেট ছুঁয়ে দেখেননি। তবে খেতে ভালবাসতেন খুব। বি.এস্‌সি, এল.এল.বি পাশ বিষ্ণুবাবু কবিতাও লিখতেন চমৎকার (কাব্যগ্রন্থের নাম : বিষ্ণু কবিতা চয়ন)। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ সুদূর জাপানেও যোগাসনের ব্যাপক প্রসার ঘটানো। '৬৮ সালে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় 'ফুজি' টিভির প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এম. নাকাও-এর সঙ্গে (সঙ্গী ছিলেন ওয়াই. জোশিমুরা)। তাঁরা তখন 'ওয়ার্ল্ড সারপ্রাইজ শো'-এর জন্য সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছেন। আমন্ত্রিত বিষ্ণুবাবু মাত্র ছ'জনের দল নিয়ে প্রথমবার জাপান গিয়েই যোগাসনের সঙ্গে 'স্টান্ট শো' দেখিয়ে বাজিমাত করে ফেলেন। '৭০ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে অবশ্য জাপানে ভারতীয় যোগের উন্নত ধারাটি ধরে রাখেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র বিশ্বনাথ ঘোষ এবং প্রিয় ছাত্র প্রেমসুন্দর দাস।

ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশকেই বিষ্ণুবাবু ব্যায়াম শেখাতেন বিনা পয়সায়। এমনও হয়েছে, অনেকেই তাঁকে দিয়ে অনুষ্ঠান করিয়ে নিয়েও পুরো পারিশ্রমিক দেয়নি। একবার ক্লাবে মাসে ৮০ টাকা চাঁদা ওঠায় বিষ্ণুবাবু শুধু খুশিই হননি, অবাকও হয়েছিলেন। অথচ এখন তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর ঢল। প্রায় ৮০০০ ছাত্রকে শেখানোর জন্য রয়েছেন শ'তিনেক শিক্ষক। এখন সেই যোগাশ্রমেই লোকে রোগ সারাতে আসছে হাতে টাকার থলি নিয়ে। পুত্র বিশ্বনাথ জানালেন, "বাবা এসব কিছুই দেখে যেতে পারেননি। লোকে তাঁর কাছ থেকে কাজ নিয়েছে, কিন্তু উপযুক্ত মূল্য দেয়নি। ভাবতে পারেন, বাবাকে নিমতলায় দাহ করার মতো টাকা আমাদের ছিল না। এক গুজরাতি বন্ধু ৫০০ টাকা ধার না দিলে শ্মশানে নিয়ে যেতে পারতাম না। আপনারাই বলুন না, যাঁর হাত দিয়ে নামী-নামী ব্যায়ামবীর বেরিয়েছেন, 'মিঃ ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতায় যিনি চিফ জাজ পর্যন্ত হয়েছেন, তাঁর প্রতি সরকারেরও কি কিছুই করার ছিল না?" তাঁর গলায় অভিমান ঝরে পড়ছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের লজ্জিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই তো করার নেই।

ঘোষেস কলেজই ক্রমে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় 'বিষ্টু ঘোষের আখড়া' নামে। এবং তখন থেকেই মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, শুধু ব্যায়ামবীর নয়, বিষ্টু ঘোষের আখড়ায় গড়ে ওঠে প্রাণবন্ত, সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক। স্বাস্থ্য-সাধনার মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলা হয় মানুষও।

সব্যসাচীর চরিত্রটি

ছবি : দেবাশিস দেব

তোমাদের সিলেবাসের 'সব্যসাচী' গদ্যাংশটি নেওয়া হয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' উপন্যাস থেকে। আলোচনা করেছেন অলক দত্ত

গড়া নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আদলে

বাংলা

এবারে তোমাদের পাঠক্রমের এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যার সম্পর্কে তোমরা অনেক কথাই জানো না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পথের দাবী' উপন্যাসের অন্তর্গত 'সব্যসাচী' পাঠ্যাংশটিই এবারের আলোচ্য বিষয়। যে 'পথের দাবী' উপন্যাসটি পরাধীন ভারতবর্ষে বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ ছিল। কী এমন ছিল এই উপন্যাসে? যার ইংরেজ সরকার বইটিকে নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল! 'পথের দাবী' সাহিত্যের সংজ্ঞায় রাজনৈতিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা'র মতো সমকালীন রাজনীতি আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু। যার মধ্যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ সোচ্চারে ধ্বনিত হয়েছে। যে উপন্যাসের মূল চরিত্র সব্যসাচীর মধ্যে ফুটে উঠেছে দেশপ্রেমের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "'পথের দাবী' বইখানি উত্তেজক, অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে।" সে জন্যই 'পথের দাবী' ইংরেজদের কাছে বিপ্লবের অশনিসঙ্কেত রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। শাসকের শক্তিকে ব্যবহার করে তারা 'পথের দাবী' উপন্যাসটিকে বাজেয়াপ্ত করেছিল। কিন্তু এর ফলে উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। বরং সে-যুগের বিপ্লবী এবং স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থখানি আরও বেশি আবেদন সৃষ্টি করেছিল।

'পথের দাবী' উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে ভারতের বাইরে ব্রহ্মদেশ-সিঙ্গাপুর অঞ্চলে। অপূর্ব হালদার নামক এক বাঙালি যুবক বীমা কোম্পানির চাকুরি নিয়ে রেঙ্গুনে উপস্থিত হয়। অপূর্ব শিক্ষিত এবং রক্ষণশীল। রেঙ্গুনে উপস্থিত হয়ে নিমাইকাকা নামক এক পুলিশকর্তার সঙ্গে তার আকস্মিক সাক্ষাৎ হয়। নিমাইকাকা তার পিতার পরিচিত। অপূর্ব তাঁর কাছে রাজবিদ্রোহী সব্যসাচী সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারে। নিমাইবাবু তাঁকে গ্রেফতার করার জন্যই এতদূর এসেছেন শুনে অপূর্ব বিস্মিত হয়। তখন তার মনে সব্যসাচী সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগ্রত হয়। সব্যসাচীকে গ্রেফতার করতে পুলিশ ব্যর্থ হওয়ায় অপূর্ব মনে-মনে খুশি হয়। রেঙ্গুনে অপূর্বর বাসস্থানে ভারতীর সঙ্গে আলাপ হয়। অপূর্ব ভারতীর সান্নিধ্যে এসে 'পথের দাবী' নামক গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেয়। যার নেতা হলেন সব্যসাচী মল্লিক। সুমিত্রা নাম্নী অন্য এক মহিলা এই সংগঠনের সম্পাদক। কিন্তু ঘটনাচক্রে অপূর্ব পুলিশের কাছে ধরা পড়ে সংগঠনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়। বিপ্লবীদের বিচারে অপূর্বর মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু অপূর্ব ও ভারতীর ভালবাসার সম্পর্কের জন্য সব্যসাচী তাকে মুক্তি দেন। সব্যসাচীর এই সিদ্ধান্তে বিপ্লবীরা রুষ্ট হন। 'পথের দাবী' সংগঠন ক্রমশ অবিশ্বাস আর মতপার্থক্যে দুর্বল হয়ে পড়ে। সুমিত্রাও সংগঠন ত্যাগ করে। নিঃসঙ্গ সব্যসাচী একাই সেই ভয়ঙ্কর পথের যাত্রী হন।

উপন্যাসের যে অংশে অপূর্ব প্রথম রেঙ্গুনে উপস্থিত হয়ে নিমাইবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল, সেটিই তোমাদের পাঠ্যাংশের অন্তর্ভূত হয়েছে।

এবারে কিছু নতুন শব্দ এবং তার অর্থ জেনে নাও :

কোহিনুর—অতি মূল্যবান রত্ন বিশেষ। রাজবিদ্রোহী—রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন যিনি। সব্যসাচী—মহাভারতের অর্জুনের অপর নাম। (যার দুই হাত সমান চলে)। দশ ইন্দ্রিয়—মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় হল পাঁচটি : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এছাড়া আরও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় হল—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ। নশ্বর—বিনাশশীল পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচটি উপাদানে মানবদেহ গঠিত। এদের পঞ্চভূত বলা হয়। করতলগতপ্রায়—হাতের মুঠোয়। অগ্রদূত—পথপ্রদর্শক। তোরঙ্গ—কাঠ বা টিনের বাক্স। পরিচ্ছদ—পোশাক। অপর্যাপ্ত—প্রচুর। তৈল নিষিক্ত—তেল দ্বারা ভেজানো। খানাতল্লাসি—অনুসন্ধান করা। ক্ষণকাল—সামান্য মুহূর্ত। অঙ্গুষ্ঠ—আঙুল, সহাস্যে—হাসির সহিত, মন্থর—ধীর।

এবারে আলোচ্য 'সব্যসাচী' পাঠ্যাংশটিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন লক্ষ করো।

রচনাধর্মী বড় প্রশ্ন

১) "কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাংলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না"—উদ্ধৃতিটি কার লেখা এবং কোন রচনাংশের অন্তর্গত? মূল গ্রন্থের নাম কী? উক্তিটির বক্তা কে? ছেলেটি কে? ছেলেটি সম্বন্ধে বক্তার এরূপ মন্তব্যের কারণ কী?

২) "যে মহাপুরুষকে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্য দেশ ছেড়ে এতদূরে আসতে হয়েছে, তার মর্জ্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করছে।"—বক্তা কে? কাকে কথাগুলি বলা হচ্ছে? কার লেখা কোন রচনা থেকে উক্তিটি উদ্ধৃত? মহাপুরুষ কে? কেন তাকে 'মহাপুরুষ' বলা হয়েছে? 'মহাপুরুষ'-এর পরিচয় দিয়ে বুঝিয়ে দাও, মন্তব্যটি নিছক ব্যঙ্গোক্তি নয়।

৩) সব্যসাচী পাঠ্যাংশটি কার লেখা এবং কোন উপন্যাস থেকে সঙ্কলিত? অপূর্ব নিমাইবাবুর মুখে সব্যসাচী সম্পর্কে যা শুনেছিল, তা সংক্ষেপে লেখো। জাহাজঘাটে দাঁড়িয়ে সব্যসাচীকে উদ্দেশ্য করে অপূর্ব একান্ত মনে যা বলেছিল, তা বিবৃত করো।

৪) "এতবড় একটা ভয়ংকর লোকের মধ্যে কোনও বিশেষত্ব নেই। নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত।" —উক্তিটি কোন লেখকের কোন রচনার অংশ? উল্লিখিত ভয়ংকর লোকটি কে? ভয়ংকর লোকটির পরিচয় দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

(১) "এ সব বোধকরি এর তাস পাশা খেলবার সামিল।" —কার কথা এখানে বলা হয়েছে? কোন-কোন ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে?

(২) "যে চার্জ আছে, তা পিনাল কোডের কোহিনুর"—কার বিরুদ্ধে কী চার্জ আছে? পিনাল কোড কী? কথাটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।
(৩) "তাই চেনাও শক্ত ধরাও শক্ত"—কাকে চেনা ও ধরা কেন শক্ত?
(৪) "ধরার চেয়ে ওয়াচ করার মূল্য বেশী"—কোন প্রসঙ্গে কার সম্বন্ধে কেন একথা বলা হয়েছে?
(৫) 'কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি"—কাকে কেন সদাশয় ব্যক্তি বলা হয়েছে?
(৬) "পুলিশের কাছে একথা কি বলতে আছে?" —কে কাকে একথা বলেছেন? কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছেন?

আলোচনামূলক অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

(১) "তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নও"—সোজা মানুষ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? সোজা মানুষটির বিপরীতে যে মানুষটির কথা ভাবা হয়েছে, তার চরিত্রের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় দাও।
(২) গিরীশ মহাপাত্রর চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা দাও।

ওপরের প্রশ্নগুলির মধ্যে, লক্ষ করো, রচনাধর্মী বড় অথবা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির অধিকাংশের মধ্যেই সব্যসাচী চরিত্রটি সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছে। তাই প্রথমে সব্যসাচীর চরিত্রের বিভিন্ন দিক কেমন করে লিখতে হবে, সে-বিষয়ে আলোচনা করছি। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নগুলির মধ্যে দু-একটি আগেই আনন্দমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। আরও লক্ষ করো মূল গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম এবং উদ্ধৃতিটির প্রসঙ্গ অধিকাংশ প্রশ্নেই জানতে চাওয়া হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ে তোমাদের প্রস্তুতি প্রয়োজন।

প্রশ্ন : 'সব্যসাচী' পাঠ্যাংশটি থেকে সব্যসাচী চরিত্র সম্পর্কে তোমার মতামত নিজের ভাষায় লেখো।

উত্তর : 'পথের দাবী' উপন্যাসের সব্যসাচী চরিত্রটি আলোচ্য পাঠ্যাংশে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের সঙ্গে তুলনীয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' উপন্যাসে বহুমাত্রিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সব্যসাচী মল্লিক স্বমহিমায় ভাস্বর। কিন্তু আলোচ্য পাঠ্যাংশে সামান্য পরিসরে সব্যসাচীর পরিচয় সামান্যই প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় মূল উপন্যাসের চরিত্রটিকে। তিনটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সব্যসাচীর পরিচয় লাভ করি— প্রথমত, নিমাইবাবুর ব্যাজস্তুতি মিশ্রিত মন্তব্য, দ্বিতীয়ত, অপূর্বর ভাবপ্রবণ স্বগতোক্তি এবং তৃতীয়ত, গিরীশ মহাপাত্ররূপী এক ছদ্মবেশী অদ্ভুত মানুষের আচার-আচরণ। 'সব্যসাচী' শীর্ষক পাঠ্যাংশে সব্যসাচীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কেবলমাত্র শেষাংশে। কিন্তু সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল সব্যসাচী। কাহিনীর নামকরণের মধ্যেই তার যথার্থতা প্রমাণিত।

কাহিনীর শুরুতে অপূর্বর সঙ্গে নিমাইবাবুর কথোপকথনে সব্যসাচীর পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। তিনি রাজবিদ্রোহী। পুলিশের চোখে তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। নানা ভাষায় তিনি বাকপটু। পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে বহুবার পলায়ন করেছেন। বন্দুক-পিস্তলে তাঁর নিশানা অভ্রান্ত। ছাত্র হিসেবেও মেধাবী। অর্থাৎ সাহসিকতায়, দেশাত্মবোধে, নেতৃত্বদানে তিনি অতুলনীয়।

আবার অপূর্বর ভাবপ্রবণ স্বগতোক্তির মধ্যে সব্যসাচীর এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরাধীন ভারতবর্ষে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে যে কতিপয় যুবক স্বার্থত্যাগ করে বহুজনের হিতাকাঙ্ক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সব্যসাচী তাঁদের অন্যতম। যিনি জীবনের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে নিজেকে বন্দি না রেখে বৃহৎ আনন্দের আশায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেও তাঁর শৌর্য-বীর্য ম্লান হয় না। তিনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। সাধারণ মানুষের পথ তাঁর কাছে রুদ্ধ, তাই পদ্মানদী সাঁতার দিয়ে তিনি পথ খুঁজে নিয়েছেন।

'সব্যসাচী' পাঠ্যাংশে গিরীশ মহাপাত্রের আচার-আচরণের মধ্যেই সব্যসাচীর প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষিত, রুচিবান একটি মানুষ দেশের মঙ্গলের স্বার্থে কী নিপুণ অভিনয় করতে পারেন, গিরীশ মহাপাত্রবেশী সব্যসাচী তার অপূর্ব উদাহরণ। কথায়, পোশাকে, আচরণে নিজেকে একজন শ্রমিক শ্রেণীর অশিক্ষিত মানুষ হিসেবে তিনি প্রমাণ করেছেন। নিমাইবাবু বা জগদীশবাবুর মতো দক্ষ পুলিশ কর্মচারীরা বুঝতেই পারেননি যে, গিরীশ মহাপাত্রই হল আসলে সব্যসাচী মল্লিক। এই অভিনয় ক্ষমতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সব্যসাচী চরিত্রটিকে আরও মহার্ঘ করে তুলেছে।

তিনটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে সব্যসাচীর যে মূল-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, তা হল তাঁর অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ। 'পথের দাবী' উপন্যাসে সব্যসাচী বলেছেন— ".....তারপরে থাক দেশের স্বাধীনতার বোঝা আমার এই মাথায়"। —এ-কথা তাঁর মতো দৃঢ়চেতা মানুষের মুখেই শোভা পায়। দেশের স্বাধীনতার বোঝা বহন করার মতো শক্তি তাঁর ছিল। বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী সব্যসাচী স্বেচ্ছায় জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে বহু বিপ্লবীর সংস্পর্শ লাভ করেই শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর মতো চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সব্যসাচী যেন চিরবিদ্রোহের প্রতীক। জীবনের কোনও প্রতিবন্ধকতাই তাঁকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। সব্যসাচীর মতো অবিচল মানুষদের উদ্দেশেই বোধহয় কবিগুরু লিখেছিলেন—

"আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই বলেই কি রইব থেমে—
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্বলবে না ॥"

প্রশ্ন : "যে মহাপুরুষকে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে..... নির্ভর করছে।"—বক্তা কে? কাকে কথাগুলি বলা হয়েছে? কার লেখা কোন রচনা থেকে উক্তিটি উদ্ধৃত? মহাপুরুষ কে? কেন তাকে মহাপুরুষ বলা হয়েছে? মহাপুরুষের পরিচয় দিয়ে বুঝিয়ে দাও মন্তব্যটি নিছক ব্যঙ্গোক্তি নয়।

বক্তা 'সব্যসাচী' রচনাংশের দায়িত্ববান পুলিশ অফিসার নিমাইবাবু।
'সব্যসাচী' রচনাংশের একটি বিশেষ চরিত্র অপূর্বকে এই কথাগুলি বলা হয়েছে।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত মূল 'পথের দাবী' উপন্যাসের অন্তর্গত 'সব্যসাচী' রচনাংশ থেকে উক্তিটি উদ্ধৃত।
আলোচ্য অংশে 'মহাপুরুষ' হলেন সব্যসাচী মল্লিক।
তাঁকে 'মহাপুরুষ' রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে মূলত ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে। পুলিশের কাছে তাঁর সম্পর্কে প্রেরিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, তিনি একজন রাজদ্রোহী। তাঁর কর্মকাণ্ডও বিচিত্র সাহসিকতায় ভরা। ইংরেজ সরকারের পুলিশ বিভাগ তাঁকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ। মহাপুরুষেরা যেমন তাঁদের কর্মময়তায় স্মরণীয় হয়ে থাকেন, সব্যসাচীও পুলিশের চোখে অপকর্মকাণ্ডে স্মরণীয়। তাই তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীতে পুলিশ বিভাগের কাছে তাঁর গুরুত্ব মহাপুরুষের মতোই।
পরিহাসপ্রিয় নিমাইবাবু সব্যসাচীকে মহাপুরুষ বলে ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। কিন্তু এই কথাটি যেন সম্পূর্ণ অর্থেই সব্যসাচীর ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হয়ে উঠেছে। অভিধানগত দিক থেকে কথাটির অর্থ 'মহান যে পুরুষ'। সত্যিই সব্যসাচীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তাঁকে ওই অভিধায় ভূষিত করতে ইচ্ছা হয়। যিনি দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের সংকল্পে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়েছেন। জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্যসম মনে করেছেন। যিনি একাধারে দেশপ্রেমিক, মেধাবী ও স্বার্থত্যাগী। যাঁর যোগ্য নেতৃত্বে শত-শত যুবক-যুবতী নির্দ্বিধায় দেশোদ্ধারে ব্রতী হয়েছে। যিনি দুঃসাহসিকতায় ইংরেজ সরকারের কাছে বিভীষিকা। তাঁর বিপ্লবী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার জন্য শাসকশ্রেণীর বিপুল আয়োজন। কারাগারের নিভৃত কক্ষ যেন তাঁর জন্যই প্রস্তুত। তাঁর দুর্দমনীয় গতিকে স্তব্ধ করার জন্যই শৃঙ্খলের প্রয়োজন। দেশের মানুষের স্বার্থে প্রবল পরাক্রান্ত শাসকের চোখে তিনি শত্রু। তাই তাঁকে মহাপুরুষ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁর পথ সহজ সরল গৃহস্থ মানুষের দৈনন্দিন হাসিকান্না বিজড়িত আত্মসুখ প্রাপ্তির পথ নয়, মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কণ্টকাকীর্ণ পথ। মহাপুরুষদের মতোই তিনি সাধারণের কাছে নমস্য। তাই নিমাইবাবুর ব্যঙ্গোক্তি ব্যাজস্তুতি হয়ে সব্যসাচীর মণিহার রূপে দীপ্তি পেয়েছে।

এবারে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নের উত্তর লেখার পদ্ধতি লক্ষ করো।

প্রশ্ন : "কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি"—কাকে কেন সদাশয় ব্যক্তি বলা হয়েছে?

উত্তর : উদ্ধৃতাংশটিতে গিরীশ মহাপাত্ররূপী সব্যসাচী সম্পর্কে নিমাইবাবু জগদীশবাবু নামক অন্য এক পুলিশ অফিসারের কাছে মন্তব্যটি করেন।

সব্যসাচী সন্দেহে যে যাত্রীদের খানাতল্লাসির জন্য ধরা হয়েছিল, তাদের মধ্যে গিরীশ মহাপাত্র অন্যতম। পোশাকে, আচার-আচরণে গিরীশ মহাপাত্র হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছিল। নিমাইবাবুর জেরার সামনে সে অত্যন্ত সপ্রতিভ ছিল। তার পকেট থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটি গাঁজার কলিকা পাওয়া গিয়েছিল। নিমাইবাবু তাকে গাঁজা খায় কিনা জিজ্ঞেস করাতে সে বলেছিল যে, গাঁজার নেশা তার নেই কিন্তু অন্য কারও প্রয়োজনে লাগতে পারে বলেই সে কলিকাটি সঙ্গে রেখে দিয়েছে। তার মতো শীর্ণ চেহারার মানুষের মুখে কথাটি নিমাইবাবুর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। তাই তিনি জগদীশবাবুর কাছে গিরীশ মহাপাত্রকে সদাশয় বলে ব্যঙ্গ করেছেন।

প্রশ্ন : "এসব বোধ করি এর তাস পাশা খেলার সামিল"—কে কার সম্বন্ধে কথাগুলি বলেছেন। এর কোন কাজকে কেন তাস পাশা খেলার সামিল বলা হয়েছে?

উত্তর : সুদক্ষ বাঙালি পুলিশ অফিসার নিমাইবাবু রাজবিদ্রোহী সব্যসাচী সম্পর্কে কথাগুলি বলেছেন।

সব্যসাচী অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তিনি জার্মানি থেকে ডাক্তারি, ফ্রান্স থেকে এঞ্জিনিয়ারিং, বিলেত থেকে আইন পাশ করে এসেছেন। কিন্তু এত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি শিক্ষাগত বৃত্তি অবলম্বন না করে দেশের মুক্তির জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন। সেজন্যই এই সম্মানগুলি সব্যসাচীর জীবনে গুরুত্বহীন। তাস বা পাশা যেমন মানুষের অবসর বিনোদনের সঙ্গী, তেমনই সব্যসাচীর উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলি জীবনের প্রধান অবলম্বন না হয়ে বিনোদনের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে বলেই নিমাইবাবু মন্তব্য করেছেন।

প্রশ্ন : "যে চার্জ আছে তা পিনাল কোডের কোহিনূর"—পিনাল কোড কী? কথাটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : 'পিনাল কোড' বিচার সংক্রান্ত একটি শব্দ। 'পিনাল কোড' বলতে ফৌজদারি মামলা বোঝায়। যার মধ্যে চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির মধ্যে রাজদ্রোহিতা সবচেয়ে বড় অপরাধ।

আলোচ্য অংশে পরিহাসপ্রিয় নিমাইবাবু সব্যসাচীর অপরাধ সম্বন্ধে উদ্ধৃটি করেছেন। কোহিনূর একপ্রকার মহামূল্যবান রত্ন বিশেষ। ফারসি কোহ (পর্বত) শব্দের সঙ্গে আরবি নূর (আলোক) শব্দের মিশ্রণে শব্দটি সৃষ্ট। এখানে সব্যসাচীর বিরুদ্ধে চার্জ অর্থাৎ রাজবিদ্রোহের অভিযোগ আছে। ফৌজদারি মামলায় এই অভিযোগ অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মূল্যবান। তাই নিমাইবাবু তাকে কোহিনূরের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

(লেখক নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক)

ই ং রে জি

জানা চাই 'পার্ট অব স্পিচ'-এর সঠিক প্রয়োগ

পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায় অথচ কোনটা কোন পার্ট অব স্পিচ, তা জানে না, এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম নয়। কীভাবে পার্ট অব স্পিচের সঠিক প্রয়োগ শিখতে হবে, জানিয়েছেন রণধীর ভট্টাচার্য

বাংলায় তো তোমরা পদান্তর শিখেছ। বিশেষ্য থেকে বিশেষণে বা ক্রিয়া থেকে ক্রিয়া-বিশেষণে রূপান্তর নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে জলভাত। ইংরেজিতেও ওরকম একটা ব্যাপার আছে। তবে সেখানে ক্রিয়াই প্রধান, verb থেকে nown, adjective ও adverb তৈরি করতে হবে। গত সংখ্যায় আমরা "Fill in the blanks with appropriate articles and prepositions" নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা করব—"**Fill in the blanks with proper verb forms or advebials or by any other given word**": এই ধরনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর লেখার জন্য তোমরা—"**change of words from one part of speech to another**" কীভাবে করা হয়েছে সেটা দেখে নাও।

Verb	Nown	Adjective	Adverb
Attract	Attraction	Attractive	Attractively
Avail	Availability	Available	
Allow	Allowance	Allowable	Allowably
Act	Action	Active	Actively
Agree	Agreement	Aggreable	Aggreably
Attend	Attention	Attentive	Attentively
Add	Addition	Additional	Additionally
Admire	Admiration	Admirable	Admirably

Verb	Nown	Adjective	Adverb
	Anxiety	Anxious	Anxiously
Argue	Argument/ Argumentation	Arguable/ Argumentative	Agrumentat-tionery
Approve	Approval	Approving	Approvingly
Apologize	Apology	Apologetic	Apologetically
Enable	Ability	Able	Ably
Boast (of)	Boast	Boastful	Boastfully
Benefit	Benefit	Beneficial	Beneficially
Beg	Beggar	Beggarly	
Beautify	Beauty	Beautiful	Beautifully
Believe	Belief	Belivable	Believably
Embody	Body	Bodied	
Embitter	Bitterness	Bitter	Bitterly
Broaden	Broadness/ Breadth	Broad	Broadly
Break	Breakage	Breakable	
Carry	Carriage	Carriageable	
	Crime	Criminal	Criminally
Collect	Collection	Collective	Collectively
Confide	Confidence	Confident	Confidently
Encourage	Courage	Courageous	Courageously
Clear	Clearness	Clear	Clearly
Criticise	Critic	Critical	Critically
Compel	Compulsion	Compulsory	Compulsorily
Ascertain	Certainty	Certain	Certainly
Desire	Desire	Desirable/ Desirous	Desirably
Endanger	Danger	Dangerous	Dangerously
Dream	Dream	Dreamy	Dreamly
Destroy	Destruction	Destructive	Destructively
Detect	Detection	Detective	
Devote	Devotee/ Devotion	Devotional/ Devoted	Devotionally
Edit	Editor/Edition	Editorial	Editorially
Deceive	Deception	Deceptive	
Educate	Education	Educational/ Educative/ Educated	Educationally
Employ	Employment	Employable	
Elect	Election	Electoral/ Elected	
Envy	Envy	Envious	
Effect	Effect	Effective	Effectively
Economise	Economy	Economic/ Economical	Economically
Expend	Expense	Expensive	Expensively
Eternalize	Eternity	Eternal	Eternally
Free	Freedom	Free	Freely
Fear	Fear	Fearful	Fearfully
Befriend	Friend	Friendly	
Frighten	Fright	Frightful	Frightfully
	Fortune	Fortunate	Fortunately
Guide	Guidance	Guidable	

Verb	Nown	Adjective	Adverb
Glorify	Glory	Glorious	Gloriously
Hate	Hatred	Hateful	Hatefully
Include	Inclusion	Inclusive	Inclusively
Justify	Justification	Justifiable	Justifiably.

Q. No. (1) Fill in the blanks with proper form of the words given in brackets.

(a) Netaji Subhas Chandra Bose was a man of (1) (act)
(b) The teacher (2) (admiration) the boy for his (3) (honest)
(c) You should not (4) (argument) with your parents.
(d) The scenery of Darjeeling is very (5) (attraction).
(e) The worker was paid (6) (allow) for overtime work.
(f) The girl was (7) (ability) to do the work properly.
(g) I was charmed by the (8) (beautiful) of Kalimpong.
(h) Social work (9) (beneficial) the society.
(i) No man should (10) (boastful) of his wealth.

Ans : (1) action (2) admires (3) honesty (4) argue (5) attractive (6) allowance (7) able (8) beauty (9) benefits (10) boast.

Q. No. (2) Fill in the blank with appropriate form of the words given in brackets.

(a) Don't (1) (bitter) the relationship with your friends.
(b) Handle glass with (2) (careful). It may (3) (breakage).
(c) Don't be ashamed to (4) (carriage) your own good.
(d) Always (5) (courage) to learn his own lesson.
(e) Police should treat the (6) (crime) with (7) (strict).
(f) Ramen will (8) (certainty) shine in life.
(g) Pumpi has (9) (desirous) to learn her lessons (10) (attention).

Q. No. (3) Rewrite the sentences after proper correction of the underlined words.

(a) It is danger to drive car on the wrong side.
(b) Atom bomb totally destruction the city of Hiroshima.
(c) Martyrs sacrificed their lives for the free of the country.
(d) The ugly face of the stranger frights the baby.
(e) His behaviour is always friend with the neighbour.
(f) Don't try to foolish the people.
(g) By our noble deeds, we can glory mother India.
(h) Every student should justification his behaviour.
(i) Knowledge will large your vision.
(j) All animals killed the fox and the wolf for their hateful of them.

Ans : (a) dangerous (b) destroyed (c) freedom (d) frightens (e) friendly (f) befool (g) glorify (h) justify (i) enlarge (j) hatred.

Q. No. (4) Fill in the blanks with the correct verb form from the alternative given in brackets.

(a) Super cyclone _____ (blew, is blowing, has been blowing) in Orissa since last night.
(b) Bill will tell Sam about the funny incident when he _____ (will ring, rings, is ringing) him.
(c) Pumpi _____ (has received, had received, received) Tumpi's letter yesterday.

(d) Shelley _____ (has left, left, had left) this place thirty minutes ago.
(e) The Bus accident _____ (occured, has occured, occurs) at College Street this evening.
(f) The technician _____ (is working, has been working, worked) for the last three hours.
(g) I _____ (did not see, have not seen, had not seen) Mantu for a month.
(h) Souren _____ (is visiting, visits) Jagannath's temple every day.
(i) The Surma _____ (flows, is flowing, has been blowing) between Sylhet and Sunamgunj.
(j) They _____ (lived, have been living) in Calcutta since 1955.

Ans : (a) has been blowing. (b) rings (c) received (d) left (e) has occured (f) has been working (g) have not seen (h) visits (i) flows (j) have been living.

(লেখক হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক)

ভূ গো ল

ছাঁকা নম্বর পাওয়া যায় ভূগোলের অঙ্কে

অনেক ছাত্রছাত্রীই ভূগোলের অঙ্ককে অকারণে ভয় পায়। অথচ, একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে করতে পারলে এর চেয়ে সহজ প্রশ্ন আর দুটো নেই।
লিখেছেন কালিদাস চন্দ

অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা ও সময়ের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম। এবার দ্রাঘিমা ও সময়ের বিভিন্ন সমস্যার দিকে নজর দেওয়া থাক। কী বলো?

অঙ্কিতা একটু ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "অঙ্কটা বাদ দিলে হয় না সার?"

অঙ্কে ভয় কেন অঙ্কিতা?

"না সার, যদি ভুল হয়ে যায়?"

আরে ভুল হবে কেন? ভূগোলের অঙ্কে আছেটা কী? যোগ-বিয়োগ-গুণ আর ভাগ, অঙ্কের তো এই চারটে নিয়ম। এই নিয়মে ভূগোলের সব অঙ্কই করা যায়। এর জন্য তো চিন্তার কোনও কারণ নেই। ত্রিকোণমিতি, পরিমিতি, পাটীগণিত, বীজগণিতের কত শক্ত-শক্ত অঙ্ক তো তোমরা করো। ভূগোলের অঙ্ক সে-তুলনায় কিছুই নয়। একেবারে জল-ভাত।

একটা কথা, অঙ্কের প্রশ্নটি কিন্তু বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক নয়। ইচ্ছে করলে না করলেও চলে। তবে এ-প্রশ্নের উত্তর ঠিক করতে পারলে অঙ্কের জন্য ছ'টি নম্বর একেবারে বাঁধা। এবার ভেবে দ্যাখো কী করবে?

"তাহলে অঙ্কটা করব সার?"

নিশ্চয়ই করবে। এবার কেমন ভাবে করবে সে- সম্পর্কে কিছু নিয়ম-কানুন জেনে রাখো।

(১) পৃথিবী নিজের মেরুরেখার ওপর সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরতে সময় নেয় ১ দিন। তাই বলা যায় পৃথিবীর বৃত্তাকার ৩৬০° পথ পেরোবার সময় হল ২৪ ঘণ্টা। এই হিসেবে প্রতি ১৫° দ্রাঘিমার ব্যবধানে সময়ের পার্থক্য ১ ঘণ্টা এবং প্রতি ১° দ্রাঘিমার পার্থক্যে সময়ের ব্যবধান দাঁড়ায় ৪ মিনিট। আর প্রতি ১ মিনিট দ্রাঘিমার পার্থক্যে সময়ের ব্যবধান হল ৪ সেকেন্ড।

একটা জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখবে, দ্রাঘিমার মিনিট (′), সেকেন্ড (″) আর সময়ের মিনিটের, সেকেন্ড কিন্তু এক নয়। ডিগ্রি হল কোণ পরিমাপের একক। প্রতি এক ডিগ্রির ৬০ ভাগের এক ভাগ হল ১ মিনিট, আর ১ মিনিট ৬০ ভাগের এক ভাগ হল ১ সেকেন্ড। এই মিনিট (′), সেকেন্ড (″) হল ১° কোণের ক্ষুদ্রাংশ।

(২) পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। তাই পূর্বদিকে সময় এগিয়ে থাকে। আর পশ্চিমদিকে সময় পিছিয়ে পড়ে।

(৩) সময়ের পার্থক্য বের করার সময় খেয়াল রেখো, যে সময়টি এগিয়ে আছে তা থেকে পিছিয়ে পড়া সময়টি বাদ দিতে হবে।

(৪) দ্রাঘিমার পার্থক্য বের করতে হলে মনে রাখবে, দুটি দ্রাঘিমাই যদি মূলমধ্য রেখার একই পাশে, অর্থাৎ দু'টিই পূর্বে বা দু'টিই পশ্চিমে থাকে তা হলে তাদের দ্রাঘিমাদু'টি বিয়োগ করতে হবে। আবার, স্থানদুটি যদি মূলমধ্যরেখার দু'পাশে থাকে, অর্থাৎ একটি পূর্বে, আর একটি পশ্চিমে তা হলে তাদের মধ্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য হবে তাদের দ্রাঘিমার যোগফল।

(৫) পশ্চিম থেকে পূর্বে আন্তর্জাতিক তারিখরেখা পার হলে স্থানীয় সময় একদিন এগিয়ে যাবে। আর পূর্ব থেকে পশ্চিমে আন্তর্জাতিক তারিখরেখা পেরোলে স্থানীয় সময় একদিন পিছিয়ে পড়বে।

(৬) রাত ১২টার পর থেকে দিন ও তারিখের পরিবর্তন ঘটবে।

(৭) 'লিপ ইয়ার'-এর বছরগুলি খেয়াল রেখো। ওই বছরগুলিতে ১ মার্চের আগের দিনটি হবে ২৯ ফেব্রুয়ারি।

(৮) দু'টি স্থানের দ্রাঘিমা জানা থাকলে, দ্রাঘিমার পার্থক্য বের করে তাকে ৪ দিয়ে গুণ করলে সময়ের পার্থক্য জানা যায়।

(৯) দুটি স্থানের সময় জানা থাকলে, সময়ের পার্থক্য বের করে তাকে ৪ দিয়ে ভাগ করলে দ্রাঘিমার পার্থক্য জানা যায়।

(১০) বেলা ১২টার পর সময়ের হিসেব সবসময় রেলের সময় অনুসারে করা দরকার। তাতে ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কা কম।

(১১) অঙ্ক করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, ইংরেজি ও বাংলা সংখ্যা যেন মিশে না যায়। হয় ইংরেজি, নয়তো বাংলা— একই রকম সংখ্যা ব্যবহার করবে। দু'টো মিশিয়ে কখনওই লিখবে না।

(১২) দ্রাঘিমা বের করার সময় খেয়াল রেখো, যে দ্রাঘিমা দেওয়া আছে, তার চেয়ে দ্রাঘিমার ব্যবধান যদি বড় হয়, তা হলে দ্রাঘিমার ব্যবধান থেকে সেই দ্রাঘিমা বিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রদত্ত স্থানটি যে গোলার্ধে রয়েছে, নির্ণেয় স্থানটি তার বিপরীত গোলার্ধে অবস্থিত হবে।

এবার কয়েকটি 'ক্যালকুলেশন'-এ চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। অঙ্ক কষতে সুবিধে হবে।

১। দু'টি স্থানের দ্রাঘিমা ১০৪° পঃ ও ৩৭° পঃ হলে তাদের মধ্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য

= ১০৪°—৩৭° = ৬৭°

২। দুটি স্থানের দ্রাঘিমা ৫০°৪৫′ পূঃ ও ১১৯°৩০′ পঃ হলে তাদের মধ্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য

= ৫০°৪৫′ + ১১৯°৩০′

= ১৬৯°৭৫′ = ১৭০°১৫′

৩। একটি স্থানের সময় সকাল ৬টা ও আর একটি স্থানের সময় বিকেল ৪টে ৩০ মিনিট হলে তাদের মধ্যে সময়ের পার্থক্য

= বিকেল ৪টে ৩০ মিনিট— সকাল ৬টা = (৪+১২) ঘণ্টা ৩০ মিনিট— ৬ ঘণ্টা

= ১৬ ঘণ্টা ৩০ মিনিট— ৬ ঘণ্টা = ১০ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

৪। দু'টি স্থানের সময় যথাক্রমে সকাল ৫টা ৪৫ মিনিট ও আগের রাত ১১টা ৩০ মিনিট হলে স্থান দু'টির মধ্যে সময়ের পার্থক্য

= সকাল ৫টা ৪৫ মিনিট— আগের রাত ১১টা ৩০ মিনিট

= আগের দিন (৫+২৪) ঘণ্টা ৪৫ মিনিট— আগের দিন (১১+১২) ঘণ্টা ৩০ মিনিট

= আগের দিন ২৯ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট— আগের দিন ২৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

= ৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

আবার, হিসেবটা এ-ভাবেও করা যেতে পারে। দেখে রাখো।

স্থান দু'টির মধ্যে সময়ের পার্থক্য

= (রাত ১২টা—রাত ১১ টা ৩০ মিনিট) + সকাল ৫টা ৪৫ মিনিট

= ৩০ মিনিট + ৫ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

= ৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

ক্যালকুলেশনগুলি বুঝতে পারছো তো?

"হ্যাঁ সার।" অনেকেই মাথা নাড়ল।

সাগ্নিক, তোমার নামের অর্থ জানো?

"হ্যাঁ সার, যজ্ঞের প্রথম আগুন যে পুরোহিত জ্বালান, তিনিই সাগ্নিক।

তাই কি? যজ্ঞের আগুন সবসময় জ্বালিয়ে রাখেন এমন ব্রাহ্মণই হলেন সাগ্নিক। অর্থাৎ সবসময় যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণকে বলা হয় সাগ্নিক। যাই হোক, এবার আর কয়েকটি ক্যালকুলেশন দেখে রাখো। কাজে আসবে।

৫। দু'টি স্থানের দ্রাঘিমার পার্থক্য ১৫৬°৩০′ এবং একটি স্থানের দ্রাঘিমা ৮২°৩০′ পূঃ হলে অন্য স্থানটির দ্রাঘিমা

= ১৫৬°৩০′-৮২°৩০′ পূঃ = ৭৪° পঃ

৬। দু'টি স্থানের মধ্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য ১১৫° এবং একটি স্থানের দ্রাঘিমা ১৫° পূঃ হলে অপর স্থানটির দ্রাঘিমা কত?

লক্ষ করো, এ-প্রশ্নে উত্তর হবে দু'টি।

স্থানটি একই গোলার্ধে অবস্থিত হলে, তার দ্রাঘিমা

= ১১৫°+১৫° পূঃ = ১৩০° পূঃ

আবার, স্থানটি বিপরীত গোলার্ধে অবস্থিত হলে, তার দ্রাঘিমা

= ১১৫°-১৫ পূঃ = ১০০° পঃ

৭। দুটি স্থানের সময় যথাক্রমে বেলা ১ টা ১৫ মিনিট ও সকাল ৯ টা ৫ মিনিট ১৩ সেকেন্ড হলে তাদের মধ্যে সময়ের পার্থক্য

= বেলা ১টা ১৫ মিনিট— সকাল ৯টা ৫ মিনিট ১৩ সেকেন্ড

= (১+১২) ঘণ্টা ১৫ মিনিট— ৯ ঘণ্টা ৫ মিনিট ১৩ সেকেন্ড

= ১৩ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ৬০ সেকেন্ড—৯ ঘণ্টা ৫ মিনিট ১৩ সেকেন্ড

= ৪ ঘণ্টা ৯ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড।

এবার, দ্রাঘিমা ও সময়ের কিছু সমস্যার সমাধান করে দেখা যাক।

"হ্যাঁ সার।"

তোমার নাম কী?

"লোটাস।"

লোটাস কেন? তুমি তো পদ্ম। বলো কী বলছিলে?

"সার, এ-বছরের মাধ্যমিকের অঙ্কটি।"

এবারের অঙ্কটি খুবই সহজ। ২০০০ সালের প্রশ্নটি ছিল, **`A' ও `B' দুটি স্থানের স্থানীয় সময় যথাক্রমে সকাল ৬টা এবং বিকেল ৬টা, সেই সময় গ্রিনিচ সময় দুপুর ১২ টা হলে `A' ও `B' স্থান দু'টির দ্রাঘিমা নির্ণয় করো। (পূর্ব বা পশ্চিম উল্লেখ করবে)**

সমাধানটি দ্যাখো।

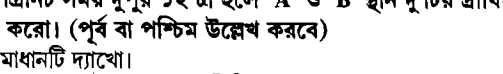

গ্রিনিচ ও A স্থানের মধ্যে সময়ের পার্থক্য

= দুপুর ১২টা — সকাল ৬ টা = ৬ ঘণ্টা

আবার, B স্থান ও গ্রিনিচের মধ্যে সময়ের পার্থক্য

= বিকেল ৬টা— দুপুর ১২টা

= (৬+১২) ঘণ্টা-১২ ঘণ্টা = ১৮ ঘণ্টা-১২ ঘণ্টা

= ৬ ঘণ্টা।

∵ ১ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে দ্রাঘিমার পার্থক্য ১৫°

∴ ৬ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে দ্রাঘিমার পার্থক্য ১৫°×৬ = ৯০°

এখন যেহেতু, A স্থানের স্থানীয় সময় গ্রিনিচ সময়ের চেয়ে পিছিয়ে আছে

∴ A স্থানটি গ্রিনিচের পশ্চিমে অবস্থিত।

∴ A স্থানের দ্রাঘিমা হবে ৯০° পঃ।

আবার যেহেতু B স্থানের স্থানীয় সময় গ্রিনিচ সময়ের চেয়ে এগিয়ে আছে

∴ B স্থানটি গ্রিনিচের পূর্বে অবস্থিত

∴ B স্থানের দ্রাঘিমা হবে ৯০° পূঃ।

উত্তর : `A' ও `B' স্থানের দ্রাঘিমা যথাক্রমে ৯০° পঃ ও ৯০° পূঃ।

সময়ের পার্থক্য থেকে দ্রাঘিমা বের করার আর একটি অঙ্ক দেখা যাক। অঙ্কটি ত্রিপুরা মাধ্যমিকে '৯৬ সালে এসেছিল। করাচিতে যখন স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩৪ মিনিট, তখন কলকাতার (৮৮°৩০′ পূঃ) স্থানীয় সময় সকাল ১০টা। করাচির দ্রাঘিমা নির্ণয় করো।

করাচি (?) কলকাতা (৮৮°৩০′ পূঃ)

সকাল ৮টা ৩৪ মিনিট সকাল ১০ টা

কলকাতা ও করাচির মধ্যে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য
= সকাল ১০ টা— সকাল ৮টা ৩৪ মিনিট
= ৯ ঘণ্টা ৬০ মিনিট— ৮ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট
= ১ ঘণ্টা ২৬ মিনিট
= ৮৬ মিনিট।
∵ ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্যে দ্রাঘিমার ব্যবধান ১°
∴ ৮৬ মিনিট সময়ের পার্থক্যে দ্রাঘিমার ব্যবধান ৮৬°/৪
= ৪৩°/২ = ২১$\frac{১}{২}$° = ২১°৩০′
∵ করাচির স্থানীয় সময় কলকাতার স্থানীয় সময়ের চেয়ে পিছিয়ে আছে
∴ করাচি কলকাতার পশ্চিমে অবস্থিত
∴ করাচির দ্রাঘিমা = কলকাতার দ্রাঘিমা— ২১°৩০′
= ৮৮°৩০′ পূঃ— ২১°৩০′
= ৬৭° পূঃ
উত্তর : করাচির দ্রাঘিমা ৬৭° পূঃ

'৯৩ সালে আসা ত্রিপুরা মাধ্যমিকের আর একটি অঙ্ক দেখা যাক। **কলকাতার (৮৮°৩০′ পূঃ) স্থানীয় সময় যখন বেলা ১১টা ৩০ মিনিট তখন টোকিয়োর স্থানীয় সময় বেলা ২টো ৫১ মিনিট। টোকিয়োর দ্রাঘিমা নির্ণয় করো।**

কলকাতা (৮৮°৩০′ পূঃ) টোকিয়ো (?)

বেলা ১১ টা ৩০ মি বেলা ২ টো ৫১ মিনিট

টোকিয়ো এবং কলকাতার মধ্যে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য
= বেলা ২ টো ৫১ মিনিট— বেলা ১১টা ৩০ মিনিট
= (২+১২) ঘণ্টা ৫১ মিনিট— ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
= ১৪ ঘণ্টা ৫১ মিনিট— ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
= ৩ ঘণ্টা ২১ মিনিট
= ২০১ মিনিট
∵ ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্যে দ্রাঘিমার ব্যবধান ১°
∴ ২০১ মিনিট সময়ের পার্থক্যে দ্রাঘিমার ব্যবধান ২০১°/৪
= ৫০$\frac{১}{৪}$° = ৫০°১৫′
∵ টোকিয়োর স্থানীয় সময় কলকাতার স্থানীয় সময়ের চেয়ে এগিয়ে আছে
∴ টোকিয়ো কলকাতার পূর্বে অবস্থিত
∴ টোকিয়োর দ্রাঘিমা = কলকাতার দ্রাঘিমা + ৫০°১৫′
= ৮৮°৩০′ পূঃ + ৫০°১৫′
= ১৩৮°৪৫′ পূঃ
উত্তর : টোকিয়োর দ্রাঘিমা ১৩৮°৪৫′ পূঃ

মাধ্যমিক 'অ্যাডিশনাল' ভূগোলের '৯২ সালের প্রশ্নটি ছিল, **শিলং-এর দ্রাঘিমা ৯২° পূর্ব। শিলং এর প্রমাণ সময় তার স্থানীয় সময়ের চেয়ে ৩৮ মিনিট পিছিয়ে থাকে। যে জায়গা থেকে শিলং-এর প্রমাণ সময় স্থির করা হয়, সেই জায়গার দ্রাঘিমা কত?**

শিলং-এর প্রমাণ সময় ও স্থানীয় সময়ের মধ্যে পার্থক্য ৩৮ মিনিট
∵ ৪ মিনিট দ্রাঘিমার পার্থক্যে সময়ের ব্যবধান ১°
∴ ৩৮ মিনিট দ্রাঘিমার পার্থক্যে সময়ের ব্যবধান ৩৮°/৪ = ১৯°/২
= ৯$\frac{১}{২}$° = ৯°৩০′
∵ শিলং-এর প্রমাণ সময় তার স্থানীয় সময়ের চেয়ে পিছিয়ে আছে
∴ শিলং-এর প্রমাণ সময় যে জায়গা থেকে স্থির করা হয় তার দ্রাঘিমা শিলং-এর পশ্চিমে অবস্থিত হবে।
∴ শিলং-এর প্রমাণ সময়ের দ্রাঘিমা
= শিলং-এর দ্রাঘিমা— ৯°৩০′
= ৯২° পূঃ—৯°৩০′
= ৯১°৬০′ পূঃ—৯°৩০′
= ৮২°৩০′ পূঃ
উত্তর : শিলং-এর প্রমাণ সময় স্থির করা হয় ৮২°৩০′ পূঃ দ্রাঘিমা থেকে।

সময়ের পার্থক্য থেকে দ্রাঘিমা নির্ণয়ের বেশ কয়েকটি অঙ্ক তো দেখা হল। এবার, দ্রাঘিমার পার্থক্য থেকে সময় নির্ণয় করার সমস্যা সম্পর্কে দেখা যাক। কী বলো?

"হ্যাঁ সার।" সকলেই রাজি।

বেশ, তা হলে প্রথম সমস্যাটি হল, **সকাল ৬টায় কায়রো (৩১° পূঃ) থেকে নিউ অর্লিন্স (৯০° পঃ)-এ একটি তারবার্তা পাঠানো হল। যথাস্থানে সেটি পৌঁছতে ৩০ মিনিট সময় লাগল। তারবার্তাটি যখন পৌঁছল, তখন নিউ অর্লিন্সের স্থানীয় সময় কত? মাধ্যমিকের অ্যাডিশনাল ভূগোলে '৯৩ সালে অঙ্কটি এসেছিল।**

নিউ অর্লিন্স (৯০° পঃ) (০°) কায়রো (৩১° পূঃ)

(?) ৩০ মিনিট সকাল ৬ টা

কায়রো ও নিউ অর্লিন্সের মধ্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য
= ৩১° + ৯০° = ১২১°
∵ ১° দ্রাঘিমার ব্যবধানে সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট
∴ ১২১° দ্রাঘিমার ব্যবধানে সময়ের পার্থক্য ১২১×৪ মিনিট
= ৪৮৪ মিনিট = ৮ ঘণ্টা ৪মিনিট
∵ নিউ অর্লিন্স কায়রোর পশ্চিমে অবস্থিত
∴ নিউ অর্লিন্সের স্থানীয় সময় কায়রোর স্থানীয় সময়ের চেয়ে পিছিয়ে থাকবে।
∴ নিউ অর্লিন্সের স্থানীয় সময়
= কায়রোর স্থানীয় সময়— ৮ ঘণ্টা ৪ মিনিট
= সকাল ৬ টা — ৮ ঘণ্টা ৪ মিনিট
= আগের দিন (৬+২৪) ঘণ্টা — ৮ ঘণ্টা ৪ মিনিট
= আগের দিন ২৯ ঘণ্টা ৬০ মিনিট— ৮ ঘণ্টা ৪ মিনিট
= আগের দিন ২১ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট
= আগের দিন রাত ৯ টা ৫৬ মিনিট
∵ তারবার্তাটি পৌঁছতে ৩০ মিনিট সময় লাগে
∴ ওই তারবার্তা নিউ অর্লিন্স পৌঁছবে

আগের দিন রাত ৯টা ৫৬ মিনিট + ৩০ মিনিট বা আগের দিন রাত ১০ টা ২৬ মিনিটে।

উত্তর : তারবার্তাটি নিউ অর্লিন্স-এ পৌঁছবে আগের দিন রাত ১০টা ২৬ মিনিটে।

আর সময় নেই। ঘণ্টা পড়ে গেছে। আজকের ক্লাস এখানেই শেষ। পরের ক্লাসে আরও কিছু অঙ্ক করার ইচ্ছে রইল। একটা কথা। আজ যা-যা শিখলে, সেগুলি কিন্তু ভালমতো রপ্ত করা চাই। টেস্টপেপার থেকে বই থেকে অঙ্ক প্র্যাকটিস করবে। প্র্যাকটিসটাই আসল। মনে রাখবে, অনুশীলনের কোনও বিকল্প নেই। ইংরেজি প্রবাদবাক্যটি সবসময় মাথায় রেখো, 'প্র্যাকটিস মেক্‌স এ ম্যান পারফেক্ট।'

(লেখক দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন-এর ভূগোলের শিক্ষক)

অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই 'মেড ইজি'-র সাহায্য নিয়ে অঙ্ক করে। এটা খুবই খারাপ অভ্যেস। জানিয়েছেন প্রশান্তকুমার বসু

সমাধানসূত্র না দেখে চেষ্টা করো নিজে করতে

অঙ্ক

এর আগে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদকে বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যতদূর মনে পড়ছে, আলোচনার শেষে কয়েকটি অঙ্ক তোমাদের অভ্যাস করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এ-সংখ্যায় আরও কয়েকটি অঙ্ক দিলাম। আগে তোমরা নিজেরা অঙ্কগুলো সমাধানের চেষ্টা করো। না পারলে, পরে কয়েকটি অঙ্ক বিষয়ে আলোচনা করা হল, সেগুলো দেখে নাও। তবে একটা ব্যাপার অবশ্যই মনে রাখবে। প্রথম চেষ্টায় যে অঙ্ক তোমরা পারবে না, ধরে নিতে হবে সেই অঙ্ক পরীক্ষায় ভুল হবে। তাই চেষ্টা করবে নিজে-নিজে একবারেই অঙ্ক সঠিকভাবে করতে। আর সমাধানসূত্র দেখে যদি অঙ্ক মেলাবার চেষ্টা করো, তবে কখনওই নিজে অঙ্ক করা শিখবে না। এজন্যই 'মেড ইজি' ধরনের বই ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে আত্মবিশ্বাস কমে যায়। এবার দ্যাখো অঙ্কগুলো।

1. $5x^3-2x^2+5x-2$.
2. $a^3+ab^2+ac^2-a^2b-b^3-bc^2$.
3. $a^2-2a+2-2/a+1/a2$.
4. $x^4+2x^3-x^2-2x+1$.
5. $(a^2-b^2)x^2+2ax+1$.
6. $4m(m-1)-3p(3p-2)$.
7. $x^2+2x-(y+1)(y-1)$.
8. $4x^4+27x^2y^2+49y^4$.
9. $25x^4-21x^2y^2+4y^4$.
10. $x^2-y^2-6ax+2ay+8a^2$.
11. $a^2-2bc-b^2+6ac+8c^2$.
12. $2a^2b^2+2b^2c^2+2c^2a^2-a^4-b^4-c^4$.
13. x^6-y^6.
14. $63a^3+6a^2-12a+8$.
15. $126a^3-6a^2+12a-8$.
16. $(p+q)^3-6(p+q)+4$.
17. x^6+4x^3-1.
18. $8x^6+7x^3-1$.
19. $(x^2-8x)^2-29(x^2-8x)+180$.
20. $(3x-y)^2+3(3x-y)(x+y)-28(x+y)^2$.
21. $(a^2-a-z)x^2-3x-1$.
22. $(t^2-t)x^2+x-(t^2+t)$.
23. $9a^2+b^2+6c^2-6ab+5bc-15ac$.
24. $2x^2+xy-3y^2-xz-4yz-z^2$.
25. $(x^2-1)^2+8x(x^2+1)+19x^2$.

প্রঃ $a^2-2a+2-2/a+1/a^2$

সংকেতঃ সমদূরত্বে থাকা রাশিগুলি এক জায়গায় করে করো। যেমন,

$(a^2+1/a^2)-2(a+1/a)+2$

$=(a+1/a)^2-2.a.1/a-2(a+1/a)+2=...$

প্রঃ $x^4+2x^3-x^2-2x+1$

$=(x^4+1)+2x(x^2-1)-x^2$

$=(x^2-1)^2+2x^2+2x(x^2-1)-x^2$

$=(x^2-1)^2+2.x.(x^2-1)+x^2=...$

প্রঃ $(a^2-b^2)x^2+2ax+1$

$=(a^2x^2+2ax+1)-(bx)^2=...$

অথবা,

$=(a+b)(a-b)x^2+(a+b)x+(a-b)x+1$

$=(a+b)x[(a-b)x+1]+1[(a-b)x+1]=...$

প্রঃ $x^2-y^2-6ax+2ay+8a^2$

$=x^2-2.x.3a+(3a)^2-y^2+2ay-a^2$

$=(x-3a)^2-(y-a)^2=...$

প্রঃ $2a^2b^2+2b^2c^2+2c^2a^2-a^4-b^4-c^4$

$=4a^2b^2-(a^4+b^4+c^4+2a^2b^2-2b^2c^2-2c^2a^2)$

$=(2ab)^2-(a^2+b^2-c^2)^2$

(আগের লাইনে, প্রথম বন্ধনীর রাশিমালায় $+2a^2b^2$ এবং $-2b^2c^2-2c^2a^2$ থাকায় আমরা a^2, b^2 ধনাত্মক চিহ্নযুক্ত এবং c^2 কে ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত ধরলাম। ওই রাশিমালাকে উলটোভাবেও লেখা যেত, অর্থাৎ a^2, b^2 কে ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত ও c^2 কে ধনাত্মক চিহ্নযুক্ত ; সেক্ষেত্রে সরলফল হল)

$=(2ab)^2-(c^2+a^2-b^2)^2$

শেষ ফলটি একই হবে। ...

অঙ্কটির দ্বিতীয় লাইনকে আরও অন্য দুভাবে লেখা যেত। সেক্ষেত্রেও শেষ ফল একই হত। যেমন

$=4b^2c^2-(a^4+b^4+c^4-2a^2b^2+2b^2c^2-2c^2a^2)$

অথবা

$=4c^2a^2-(a^4+b^4+c^4-2a^2b^2-2b^2c^2+2c^2a^2)$

প্রঃ x^6-y^6

$=(x^3)^2-(y^3)^2$

$= (x^3+y^3)(x^3-y^3) = ...$
অঙ্কটি অন্যভাবেও করা যায়, যেমন
$= (x^2)^3-(y^2)^3 = (x^2-y^2)(x^4+x^2y^2+y^4) = ...$
তবে এভাবে করলে অনেক সতর্ক থাকতে হবে কারণ $x^4+x^2y^2+y^4$ কে আবার উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় x^2-y^2 কে $(x+y)(x-y)$ আকারে প্রকাশ করেই অঙ্কটি শেষ করে দেয়। কিন্তু না, অঙ্কটি আরও একবার বিশ্লেষিত হবে ; $x^4+x^2y^2+y^4 = (x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$
অবশ্যই আগের পদ্ধতিতে অঙ্কটি অনেক সহজে এবং তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।
প্রঃ $63a^3+6a^2-12a+8$
অঙ্ক মুখস্থ করা উচিত নয়, কিন্তু বারবার অভ্যাস করার ফলে বেশ কিছু বিশেষ অঙ্ক মুখস্থ হয়ে যায়। বেশ কিছু অঙ্ক আছে, যা একটি বিশেষ নিয়মেই কেবলমাত্র হয়ে থাকে। অঙ্ক মুখস্থ করতে না হলেও ওই বিশেষ নিয়ম সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। প্রচুর অভ্যাস করার ফলে, বিশেষ অঙ্কগুলির ক্ষেত্রে, অনেক ক্ষেত্রে অঙ্কগুলি পর্যবেক্ষণ করলেই ওই বিশেষ নিয়মের সন্ধান পাওয়া যায়।
এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রাশিমালায় চারটি পদ। সুতরাং $(a\pm b)^3$ আকার সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে হবে, ব্যর্থ হলে vanishing method ব্যবহার করব।
$8 = 2^3$ এবং $64a^3 = (4a)^3$ এই সূত্র ধরে আমরা এগোবার চেষ্টা করব।
$= (4a)^3-a^3+3.a^2.2-3.a.2^2+2^3$
$= (4a)^3-(a-2)^3 = ...$
অনুরূপ প্রশ্ন : $126p^3-6p^2+12p-8$
অনেক সময় তোমরা এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে এধরনের প্রশ্ন তৈরি করে করতে দিতে পারো। বেশ মজা হবে, অঙ্ক শেখাও হবে, প্রচুর stock বাড়বে। এছাড়া পেছন দিক থেকে অঙ্ক করা অভ্যাস থাকলে (১) অঙ্ক সম্পর্কে ধারণা বাড়ে (২) প্রশ্ন ভুল থাকলে বা মুদ্রণ দোষ থাকলে ছাত্রছাত্রী নিজেই তা নির্ণয় করতে পারে (৩) কী ভুল, কোথায় ভুল তা নিজে-নিজেই ঠিক করা যায় (শিক্ষকের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না) (৪) অঙ্ক ঠিক হয়েছে কি না তা চেক করাও যায়।
যেমন
$a^3-(2a+1)^3$, $(2a)^3+(a-1)^3$ ইত্যাদি আকারে লিখে সরলভাবে নতুন-নতুন অঙ্ক তৈরি করা যায়। বস্তুত এ-ধরনের গুণ বা সরল তোমরা অষ্টম শ্রেণীতে অভ্যাস করেছ।
অনুরূপ প্রশ্ন : $8x^3+10x^2+5x+1$,
অথবা $m^3+6m^2+12m+9$
প্রঃ $(p+q)^3+(p+q)-2$
$= (p+q)^3-1^3+[(p+q)-1] ...$
প্রঃ $(p+q)^3-6(p+q)+4$
$= (p+q)^3-2^3-6[(p+q)-2] = ...$
আলোচনার শেষ নেই। কিন্তু যেহেতু সবরকমের আলোচনা করতে হবে, তাই বিস্তৃত আলোচনা ছেড়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যাওয়া যাক।
$a^3+b^3+c^3-3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$ আকারের উৎপাদক বিশ্লেষণ
প্রঃ $27x^3-8y^3-64-72xy$
$= (3x)^3+(-2y)^3+(-4)^3-3.(3x)(-2y)(-4) = ...$
প্রঃ $1-125a^3+z^3+15az$
ওপরের সূত্র থেকে পাওয়া যায়, যদি $a+b+c = 0$ হয়, তবে $a^3+b^3+c^3 = 3abc$
প্রঃ $(x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3$
সংকেতঃ $(x-y)+(y-z)+(z-x) = 0$
$\therefore$ প্রদত্ত রাশিমালা $= 3(x-y)(y-z)(z-x)$
প্রঃ $(2x-y)^3-(x+y)^3+(2y-x)^3$
প্রঃ $(a+b+c)^3-a^3-b^3-c^3$
প্রঃ a^6+5a^3+8
$= (a^2)^3+(-a)^3+(2)^3-3.(a^2)(-a).2$
দ্বিতীয়পদ $5a^3 = -a^3+6a^3$, এভাবে প্রকাশ করতে হলে বিশেষ দক্ষতার সাহায্য নিতে হয়। প্রথমে $(a)^3$, $-3(a^2)(a)^2$ এভাবে লেখা হল। এরপর, a র চিহ্ন এবং সহগ পরিবর্তন করে বা নানাভাবে গণনা করে রাশিদুটির বৈজিক সমষ্টি $5a^3$ করতে হয়। এক্ষেত্রে $(-a)^3$ এবং $-3(a^2)(-a)2$ করতে হবে। এরপর সূত্র অনুসারে করো।
প্রঃ $8a^6+7a^3-1$
$= (2a^2)^3+(a)^3+(-1)^3-3.(2a^2)(a)(-1), = ...$
মাধ্যমিকে এ-ধরনের অঙ্ক খুব একটা আসেনি, তবে অভ্যাস রাখা ভাল। টেস্ট পরীক্ষা অবধি প্রয়োজন হতে পারে।

দ্বিঘাত রাশিমালার মধ্যসহগ বিশ্লেষণের সাহায্যে উৎপাদক নির্ণয় ঃ

■ এ-ধরনের প্রশ্নে রাশিমালার পদসংখ্যা তিন থাকে।
■ রাশিমালাকে চলরাশির ঘাতের সাপেক্ষে, ঊর্ধ্বক্রমানুসারে বা নিম্নক্রমানুসারে সাজাতে হবে। অর্থাৎ $x^2-9x+18$ বা $18+19x+x^2$ আকারে প্রকাশ করে নিতে হবে।
■ চলরাশির ঘাত পরপর না থাকলেও, সেটিকে যদি পরপর আকারে প্রকাশ করা যায়, তা হলেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে। যেমন
প্রঃ $a^4+5a^2+6 = x^2+5x+6 = .., (a^2 = x$ ধরে পাই)
প্রঃ $x^6-10x^3+16 = a^2-10a+16 = ... (x^3 = a$ ধরে পাই)
প্রঃ $(x^2-8x)^2-29(x^2-8x)+180$
$= a^2-29a+180$
$= a^2-20a-9a+180$
$= a(a-20)-9(a-20)$
$= (a-20)(a-9) = (x^2-8x-20)(x^2-8x-9) = ...$
এরপর উৎপাদক দুটি যদি আবার বিশ্লেষিত হয় তবে তা করতে হবে।
প্রঃ $(3x-y)^2+3(3x-y)(x+y)-28(x+y)^2$
$= a^2+3ab-28b^2 = (a+7b)(a-4b) = ...$
প্রঃ $x^2+7x-(a+6)(a-1)$
$= x^2+(a+6)x-(a-1)x-(a+6)(a-1)$
$= x(x+a+6)-(a-1)(x+a+6) ...$
এক্ষেত্রে শেষ পদটিকে, $(a+6)-(a-1) = 7$ আকারে বিশ্লেষণ করা হল।
প্রঃ $a^2+a-(p+1)(p+2)$
প্রঃ $(x-1)(x-2)(x+3)(x+4)-36$
$= [(x+3)(x-1)][(x-2)(x+4)]-36$
$= (x^2+2x-3)(x^2+2x-8)-36$
[প্রথম চারটি রাশিকে এমনভাবে দুটি-দুটি করে জোড় তৈরি করা হল যেন তাদের সকলের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে]
$= a(a-5)-36$ [$x^2+2x-3 = a$ ধরে পাই]
$= a^2-5a-36$
$= (a-9)(a+4) = ...$
[a এর মান বসিয়ে, যদি প্রয়োজন হয় তবে আবার উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে]
প্রঃ $(x^2-1)x(x+2)-8$
$= (x+1)(x-1)(x+0)(x+2)-8$
$= [x(x+1)][(x-1)(x+2)]-8 ...$
প্রঃ $x^4-6x^3-x^2+30x+24$
[এই অঙ্কটির ক্ষেত্রে সমদূরত্ব পদ এক জায়গায় করে করা যাবে না। $(a+b)^2$ আকারে প্রকাশ করে করতে হবে]
$= (x^2)^2-2.x^2.(3x)+(3x)^2-10x^2+30x+24$
$= (x^2-3x)^2-10(x^2-3x)+24$
$= a^2-10a+24$ [$x^2-3x = a$ ধরে পাই]
$= ...$

প্রঃ $a^4-6a^3+15a^2-18a+5$
প্রঃ $4x^2+3x-1$
প্রঃ $6x^2-x-1$
প্রঃ $14x^2+19x-3$
প্রঃ $(a-1)x^2-x-(a-2)$
সংকেতঃ $(a-1), -1, (a-2)$ কে এমনভাবে সাজাতে হবে যার বৈজিক সমষ্টি -1 হবে।
$= (a-1)x^2-(a-1)x+(a-2)x-(a-2)$
$= (a-1)x[x-1]+(a-2)[x-1] = ...$
প্রঃ $(a^2-a-2)x^2-3x-1$
$= (a-2)(a+1)x^2-3x-1$
$= (a-2)(a+1)x^2+(a-2)x-(a+1)x-1 = ...$
প্রঃ $(t^2-t)x^2+x-(t^2+t)$
$= t(t-1)x^2+x-t(t+1)$
$= t(t-1)x^2+t^2x-(t^2-1)x-t(t+1) = ...$
প্রঃ $3(a+b)^2-10(a^2-b^2)+3(a-b)^2$
$= 3x^2-10xy+3y^2 = ...$ [$a+b = x, a-b = y$ ধরে পাই]
প্রঃ $5(x^2-y^2)^2-8xy(x^2-y^2)-13x^2y^2$
প্রঃ $9a^2+b^2+6c^2-6ab+5bc-15ac$
[রাশিমালাটিকে a-র ঘাতের ক্রমানুসারে বা b-র ঘাতের ক্রমানুসারে বা c-র ঘাতের ক্রমানুসারে সাজানো যায়। মধ্যবর্তী ধাপগুলি আলাদা হলেও শেষ উত্তর একই হবে। যেমন
$= 9a^2-a(6b+15c)+(b^2+6c^2+5bc)$
$= 9a^2-a(6b+15c)+(b+3c)(b+2c)$
$= 9a^2-3(b+3c)a-3(b+2c)a+(b+3c)(b+2c)$
$= ...$
প্রঃ $(x^2-1)^2+8x(x^2+1)+19x^2$
$= (x^2+1)^2-4x^2.1+8x(x^2+1)+19x^2$
$= (x^2+1)^2+8x(x^2+1)+15x^2$
$= (x^2+1)^2+3x(x^2+1)+5x(x^2+1)+15x^2 = ...$
এক্ষেত্রে মধ্যপদ $8x(x^2+1)$ কে ধরে এগোতে হবে। তাই $(x^2-1)^2$ কে $(x^2+1)^2-4x^2$ আকারে প্রকাশ করে করা হল।
বিভিন্ন আকারের রাশিমালাকে এত বিভিন্ন রকমের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় যে, তা স্বল্প পরিসরে বলে শেষ করা সম্ভব হয় না। তবুও মাধ্যমিকের জন্য প্রয়োজনীয় যে-যে পদ্ধতি তার প্রায় সবটুকু আলোচনা করা হল।

পরিমিতি

এবারে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ও পরিসীমা নিয়ে আলোচনা করব।
সূত্রাবলী
• ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = ভূমি × উচ্চতা/2 বর্গ একক
• সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = সমকোণ সংলগ্ন বাহুদুটির গুণফল/2 বর্গ একক
• কোনও ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a, b, c একক হলে তার অর্ধ পরিসীমা $s = (a+b+c)/2$ একক
তার ক্ষেত্রফল = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ বর্গ একক
• কোনও সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a একক হলে
তার পরিসীমা = 3a একক
তার ক্ষেত্রফল = $\sqrt{3a^2/4}$ বর্গ একক
তার উচ্চতা = $a\sqrt{3/2}$ একক
• সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদুটির দৈর্ঘ্য a একক এবং অন্যটি b একক হলে
তার পরিসীমা = 2a+b একক
তার ক্ষেত্রফল = $(b\sqrt{4a^2-b^2})/4$ বর্গ একক

প্রঃ ত্রিভুজাকৃতি একটি উদ্যানের বাহুগুলির অনুপাত 2:3:4 এবং উদ্যানের পরিসীমা 216 মিটার ; উদ্যানের ক্ষেত্রফল কত?
সংকেতঃ উদ্যানের বাহুগুলি যথাক্রমে 216×2/9 মি, 216×3/9 মি, 216×4/9 মি।
∴ উদ্যানের অর্ধ পরিসীমা = ...
প্রঃ একটি সামান্তরিকের একটি কর্ণ 34 সেমি ; তার সন্নিহিত বাহু দুটি যথাক্রমে 42 সেমি ও 20 সেমি হলে, তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
সংকেতঃ সামান্তরিকের কর্ণ তাকে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে বিভক্ত করে। এখন কর্ণ ও সন্নিহিত বাহু দুটি দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

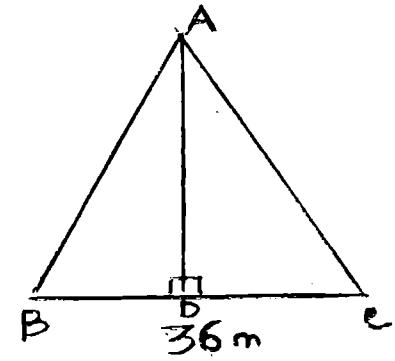

প্রঃ কোনও ত্রিভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্য 4:5:7 তার পরিসীমা 144 মি. ত্রিভুজটির ক্ষুদ্রতম বাহুর বিপরীত কৌণিক বিন্দু থেকে তার লম্ব দূরত্ব কত?

ত্রিভুজের বাহু তিনটি যথাক্রমে,
144 মি. × 4/16 = 36 মি | ∴ ত্রিভুজটির অর্ধ পরিসীমা
144 মি. × 5/16 = 45 মি | = 144 মি./2
144 মি. × 7/16 = 63 মি | = 72 মি.

ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল = $\sqrt{72(72-36)(72-45)(72-63)}$ বর্গ মি.
$= 324\sqrt{6}$ বর্গ মি.
অন্যভাবে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল = 36×AD/2 বর্গ মি.
∴ $36\times AD/2 = 324\sqrt{6}$ ...
প্রঃ দুটি ত্রিভুজের উচ্চতার অনুপাত 4:3, এবং তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত 3:4 ; ত্রিভুজ দুটির ভূমির দৈর্ঘ্যের অনুপাত নির্ণয় করো।
সংকেতঃ মনে করো ত্রিভুজ দুটির উচ্চতা যথাক্রমে 4h মি., 3h মি., এবং ত্রিভুজ দুটির ভূমি যথাক্রমে a মি, b মি.
∴ ত্রিভুজদুটির ক্ষেত্রফলের অনুপাত = (1/2.a.4h):(1/2.b.3h)
$= 4a:3b$
∴ $4a:3b = 3:4$
∴ $a:b = 9:16$
প্রঃ একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ ধারক বাহু দুটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 12 সেমি ও 16 সেমি। ত্রিভুজটির সমকৌণিক বিন্দু থেকে অতিভুজের ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য কত?
মনে করো ওই লম্বের দৈর্ঘ্য = h সেমি
অতিভুজ = $\sqrt{12^2+16^2}$ সেমি = 20 সেমি
অতিভুজকে ভূমি ধরলে,
ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল = 1/2(20×h) বর্গ সেমি
সাধারণভাবে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল = 1/2(12×16) বর্গ সেমি ...
আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক।

(লেখক নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক)

উপেন্দ্রনাথের আবিষ্কার খুলে দিয়েছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত

কলকাতার ক্যাম্পবেল হাসপাতালে দলে দলে ভর্তি হচ্ছেন অদ্ভুত এক জ্বরে আক্রান্ত মানুষ। এই রোগে কমে যাচ্ছে শরীরের রক্ত। বিশ্রীভাবে বেড়ে যাচ্ছে যকৃৎ আর প্লীহা। আক্রান্তের চুল উঠে যাচ্ছে। দেহের বর্ণ ঘোর কালো। ভর্তি হওয়া অসুস্থ মানুষরা দ্রুত মারা যাচ্ছেন। আক্রান্ত মানুষকে কী করে সুস্থ করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না নামী চিকিসকরা। উচ্চ মাত্রার কুইনিন, ক্ষার, মজ্জারস, আর্সেনিক, পারদসহ বিভিন্ন ধাতু ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে সুফল মিলছে না। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণাই তরুণ চিকিৎসক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীকে ওই অজ্ঞাত জ্বর নিয়ে গবেষণার প্রেরণা জোগাল। টানা ছ' বছর ওই কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য ব্যয় করে পৃথিবীকে কালান্তক রোগের হাত থেকে মুক্তি দিলেন উপেন্দ্রনাথ। আবিষ্কৃত হল, 'ইউরিয়া স্টিবামাইন'। অথচ তাঁর আবিষ্কৃত ওই ওষুধের মতোই বিস্মৃতির অতলে প্রায় হারিয়ে গিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। এ-বছর ৭ জুন ছিল এই বাঙালি বিজ্ঞানীর ১২৫তম জন্মদিন।

এক সময় কালাজ্বর মানেই ছিল 'কাল' বা মৃত্যু। বাংলা, বিহার, ওড়িশা, আসাম, চেন্নাই (পূর্বতন মাদ্রাজ) এমনকী ইউরোপ, আফ্রিকায় কালাজ্বরে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা ছাড়া অন্য কোনও পথ ছিল না। জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ১৯০৩ সালে বেশ কিছু ইংরেজ সৈনিকের মৃত্যু হয় দমদমে। এই 'দমদম জ্বরে' আক্রান্ত এক সৈনিকের প্লীহা পরীক্ষা করতে করতে লিশম্যান নামের এক চিকিৎসক দেখতে পান আক্রান্ত প্লীহার অংশে কিলবিল করছে এক ধরনের অসংখ্য পরজীবী। চেন্নাইয়ে বসে জ্বরাক্রান্ত মানুষের প্লীহায় ওই জাতীয় জীবাণু বা পরজীবীর সন্ধান পেলেন ১৯০৩ সালে অন্য এক চিকিৎসক ডোনোভান । ওই জীবাণুর নাম রাখা হল 'লিশম্যান-ডোনোভান বডি'। কলকাতা মেডিকেল কলেজের অণুজীব বিশেষজ্ঞ লিওনার্দ রজাস খুঁজে পেলেন, কালাজ্বরের এই জীবাণু এক ধরনের মাছিই ছড়িয়ে দেয়। স্কুল অব ট্রপিক্যালের নোলস গবেষণাগারে এক ধরনের বেলে মাছি বা স্যান্ড ফ্লাইকে কালাজ্বরে আক্রান্ত মানুষের রক্ত খাইয়ে দেখেন মাছির অন্ত্রে বেড়ে উঠছে কালাজ্বরের জীবাণু।

এত আবিষ্কার সত্ত্বেও কাজের কাজ হচ্ছিল না। সন্ধান মিলছিল না কালাজ্বরের ওষুধ অথবা প্রতিষেধকের। শেষে উপেন্দ্রনাথের 'ইউরিয়া স্টিবামাইন' হাজার হাজার আক্রান্ত মানুষের কাছে পৌঁছল ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো।

১৮৭৫-র ৭ জুন উপেন্দ্রনাথের জন্ম বিহারের জামালপুরে। বাবা নীলমণি ব্রহ্মচারী ছিলেন রেলের চিকিৎসক। জামালপুর থেকেই স্কুলের প্রবেশিকা এবং পরে এফ এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন উপেন্দ্রনাথ। ১৮৯৩ সালে হুগলি কলেজ থেকে গণিতে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। এর পরে একই সঙ্গে রসায়ন পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সি এবং চিকিৎসাবিদ্যার জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এই দুই বিদ্যার সমন্বয়ই তাঁর ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কারে সাহায্য করেছিল। ১৮৯৪ সালে রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম উপেন্দ্রনাথকে পদক দিয়ে সম্মান জানায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ছ' বছর পরে এম বি আর এবং এর দু' বছর পর তিনি এম ডি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৮৯৪ থেকে ১৯০৪ —এই ১৪ বছরে নানা পুরস্কার দিয়ে এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে সম্মান জানিয়েছে বিভিন্ন সংস্থা। ১৯১১ সালে তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেওয়া হয়। আর ১৯৩৪-এ ইউরিয়া স্টিবামাইনের মতো জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের আবিষ্কর্তাকে 'নাইট' উপাধি দিয়ে সম্মান জানায় ইংরেজ শাসকরা।

১৯০১-এ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেটেরিয়া মেডিকা শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন উপেন্দ্রনাথ। ১৯০৫—১৯২৩, কলকাতার ক্যাম্পবেল (অধুনা নীলরতন সরকার) হাসপাতালের তিনি ছিলেন মেডিসিন শিক্ষক। এই সময়ের মধ্যে ১৯১৫—'২১, দীর্ঘ ছ' বছরের গবেষণাই তাঁকে কালাজ্বরের সঠিক ওষুধের সন্ধান দেয়। ক্যাম্পবেল হাসপাতালের গবেষণাগারে ছোট্ট ঘরে প্রচণ্ড অসুবিধের মধ্যেও মাত্র কয়েকজন সহকারীকে নিয়ে তিনি যে ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন, তা শুধু ভারতই নয়, পৃথিবীর বহু দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে কালাজ্বর নামের মারণ রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের কাজে। শুধু ওষুধ আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হননি উপেন্দ্রনাথ ওই রোগের কারণ, লক্ষণ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা করে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। পরীক্ষাগারে কালাজ্বর নির্ণয়ে তাঁর রক্ত-পরীক্ষা পদ্ধতি আজও চিকিৎসকদের অনুসরণ করতে হয়। ম্যালেরিয়া এবং রসায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ। ১৯৩৬ সালে ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন এই খ্যাতিমান বিজ্ঞানী।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রয়াত হন এই বিজ্ঞানী।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

পৃথিবীর নানা দেশে এক সময় কালাজ্বর ছিল বিভীষিকার মতো। এই মারণব্যাধির কবল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করেছিলেন বাঙালি বিজ্ঞানী সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। প্রায়-বিস্মৃত এই প্রতিভাবান মানুষটির সাফল্যের কথা লিখেছেন রানা সেনগুপ্ত

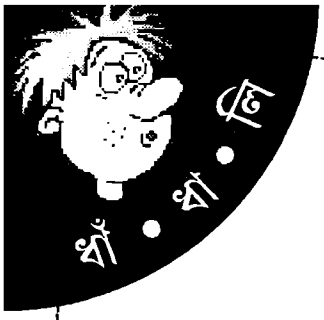

আধখানা ডিম আধখানা কলা

সেদিন বেশ একটা মজার কান্ড হয়েছে। আমি আমার পড়ার টেবিলে বসে আছি। হঠাৎ 'আধখানা' 'আধখানা' বলতে বলতে ঘরে ঢুকল গোবর্ধন।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করি, "সে কী রে! এসব কী বলছিস তুই! 'আধখানা' আবার কী কথা?"

গোবর্ধন বলল, "কেন, তুই যে কাল সন্ধেবেলা প্রশ্ন করলি, তোর মামা নাকি বাজার থেকে ছ'টা কলা কিনে আনতে তার মধ্যে রাস্তাতেই সাড়ে পাঁচটা খেয়ে নিল। ক'টা রইল? তোর এই আজগুবি প্রশ্ন শুনে সকলেই একসঙ্গে হোহো করে হেসে উঠল। আমার আর কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি।"

এবারে আমি একটু স্বাভাবিক হলাম, "তাই বল।"

গোবর্ধন সোজা হিসেব দেখিয়ে দিল। "ছ'টার মধ্যে সাড়ে পাঁচটা খেয়ে নিলে বাকি রইল আর আধখানা। ঠিক কি না?"

আমি প্রশ্নটা একটু অন্যরকম করলাম। "আচ্ছা মনে কর, যদি ছ'টা কলার মধ্যে ছাগলে পাঁচটা খেয়ে নেয় তবে ক'টা অবশিষ্ট থাকে?"

গোবর্ধন বলল, "একটা।"

"তা হলে? ছাগলে পাঁচটা খেয়ে নিলে থাকে একটা। আর ষাঁড়ে পাঁচটা খেয়ে নিলে বুঝি থাকে আধখানা? তাজ্জব হয়ে যাই তোর কথা শুনে।"

গোবর্ধনের এবার অবাক হওয়ার পালা। তবুও সবজান্তার ভাব দেখিয়ে বলল, "আমি ভেবেছিলাম সাড়ে পাঁচটা খেল, আসলে ষাঁড়ে পাঁচটা খেল!"

"হ্যাঁ ঠিক তাই, আমি তো প্রথম থেকেই বলছি একই কথা, ষাঁড়ে পাঁচটা খেল।"

'আধখানা' বলতে মনে পড়ে গেল, আরও এক মজার কথা।

ডিমের অর্ধেক

সেবার আমি, গণপতি আর গোবর্ধন পুজোর ছুটিতে গেছি কালিয়াগঞ্জ, আমার ছোটপিসির বাড়ি। কাছেই ধনকোল হাট। পিসিমা আমাদের দায়িত্ব দিলেন ধনকোল হাট থেকে কয়েকটা ডিম কিনে আনতে। সেইমতো আমরা তিনজন হাটে গেলাম একটা

দোকানে। একটি লোক ঝুড়িতে কয়েকটা ডিম নিয়ে বসে ছিল বেচবে বলে।

আমরা প্রথমেই তিনজনে নিজেদের মধ্যে একটা মজার চুক্তি করলাম। ঠিক হল, আমরা সকলে আধখানা করে ডিম কিনব, আর যা কিনব সব অর্ধেক হিসেবে।

গোবর্ধন প্রথমে লোকটির কাছে গিয়ে ঝুড়িতে যত ডিম ছিল তার অর্ধেক আর একটা আধখানা ডিম কিনল। যত ডিম ঝুড়িতে রইল তার অর্ধেক আর একটা আধখানা ডিম কিনল গণপতি। এর পর অবশিষ্টের অর্ধেক ও আরও একটি ডিমের অর্ধেক কিনে নিলাম আমি।

লক্ষ করলাম আর মাত্র একটি ডিম পড়ে রয়েছে লোকটির ঝুড়িতে।

এখন আমার প্রশ্ন, লোকটির ঝুড়িতে প্রথমে কত ডিম ছিল?

জানি, আমার কথা শুনে ধোঁকা লেগে যেতে পারে অনেকের মনেই। একটা ডিমের আধখানা? আধখানা ডিমের আবার অর্ধেক! এইভাবে ডিম কেনা?

কিন্তু সত্যিই আমরা সেদিন এইভাবেই ডিম কিনেছিলাম।

গুনেনবাবুর গুণের ছক

ধনকোল হাটের কাছেই গুনেনবাবুর বাড়ি। গুনেনবাবু আমার পিসেমশাইয়ের বন্ধু। হাট থেকে ফেরার পথে আমরা গেলাম গুনেনবাবুর বাড়ি। গিয়ে দেখি গুনেনবাবু টেবিলের ওপর একটা ছক কেটে কীসব লিখে যাচ্ছেন!

কাছে যেতে বললেন, "এটা গুণের ছক। লক্ষ করে দ্যাখো, এই ছকে সংখ্যাগুলি এমনভাবে সাজানো যে, ওপর-নীচ লম্বালম্বি কিংবা পাশাপাশি প্রত্যেক সারিতেই সংখ্যাগুলির গুণফল সমান। অবশ্য কোনাকুনি গুণফল আলাদা।"

আমাদের কৌতূহলের মাত্রা বেড়ে গেল। পরীক্ষা করে দেখলাম, সত্যিই তাই!

গুনেনবাবু ছকের সংখ্যাগুলি হঠাৎ এলোমেলো করে দিলেন। তাতে ছকের চেহারা দাঁড়াল এরকম :

৩	৪	৫
৬	৮	৯
১০	১২	১৫

তারপর গুনেনবাবু বললেন, "অনেক সাধ্যসাধনা করে ছকটি সাজিয়েছিলাম। এবারে তোমরা ওইরকম করে সাজাও দেখি, পারো কি না।"

৭ জুন সংখ্যার উত্তর

মামার জয়

ফারেনহাইট স্কেলে, প্রথম স্থানের তাপমাত্রা = ৪০° ফা

য় স্থানের তাপমাত্রা = ৮০° ফা

অর্থাৎ দ্বিগুণ।

কিন্তু সেন্টিগ্রেড স্কেলে,

৪০° ফা = ৪.৪° সে.

৮০° ফা = ২৬.৬° সে.

অর্থাৎ সেন্টিগ্রেড স্কেলে তাপমাত্রা প্রায় ছয়গুণ।

গোবর্ধনের গোয়েন্দাগিরি

প্রদত্ত সঙ্কেত থেকে পাওয়া যায়,

দা + সে — য়ু = ১০ বা ০

লু + প — টা = ৯ বা ০

ফে + তো — জ = ০ বা ১

অতএব, সব যোগ করে

ফে + লু + দা + তো + প + সে — (জ + টা + য়ু) = ১৯ বা ১

কিন্তু প্রদত্ত ৯টি অক্ষর দিয়ে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত অঙ্কগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই সবক'টি অক্ষরের যোগফল সবক'টি অঙ্কের যোগফলের সমান। অর্থাৎ :

ফে + লু + দা + তো + প + সে + জ + টা + য়ু = ৪৫

এই দুটি সম্পর্ক থেকে পাওয়া যায়,

জ + টা + য়ু = ১৩ বা ২২

এবারে, একটু পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় :

ফে = ৪, লু = ৫, দা = ৮, তো = ৩, প = ২, সে = ১ জ = ৬, টা = ৭, য়ু = ৯ অর্থাৎ ৪৫৮ + ৩২১ — ৬৭৯ = ১০০

এর অন্য আর-একটি সমাধান হল,

ফে = ২, লু = ৫, দা = ৭, তো = ১, প = ৮, সে = ৯, জ = ৩, টা = ৪, য়ু = ৬ অর্থাৎ ২৫৭ + ১৮৯ — ৩৪৬ = ১০০

তা হলে ধাঁধাটির দুটি সমাধান হল, ১৪৫৮ অথবা ৭৯২, কারণ,

৪৫৮ + ৩২১ + ৬৭৯ = ১৪৫৮

২৫৭ + ১৮৯ + ৩৪৬ = ৭৯২

অমল ভৌমিক

অ্যাসটেরিক্স ও নর্ম্যান দল

গল্প : গোসিনি
ছবি : ইউদেরজো

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

টিনটিন ★ হার্জে সোভিয়েত দেশে টিনটিন

টিনটিন ★ হার্জে সোভিয়েত দেশে টিনটিন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

অরণ্যদেব

তোমাদের জালে এই পবিত্র মাছ ধরা পড়লে কী করবে?
ফের জলে ছুড়ে দেব।

মাছ ধরার নিষেধ আর নেই।

মাছ মিলছে, জঙ্গলে শান্তি ...
ফের মাছ মিলেছে ... কিনতে এসো
মোরিরা মাছ পেয়েছে!

স্বর্গোদ্যানের পশুরা খাবার পাবে এবার ...

খুশি বাঘ-সিংহরা

4-19
আতঙ্ক কাটায় খুশি তৃণভোজী প্রাণীরাও

এগুলো কিন্তু সেই পবিত্র মাছ
জলে ফেলে দিই।

সমস্যা মিটে যাওয়ায় খুশি দু'তরফই ...
এর পর : রহস্য

খাদিম-এর ইজবরল

ওলটপালট

নীচে আছে চারটি শব্দ। প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো। অক্ষরগুলো ঠিকমতো সাজালেই পাওয়া যাবে সঠিক শব্দটি।

ভতরায়স

গ্রায়সলব

পরিজবারার

নবনমাজমি

বন্য শূকরের ভয়ে আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের শিকারি যা দিয়েছিল

উত্তর আগামী সংখ্যায়

এবারে পাশের গোলচিহ্নের ভেতরের অক্ষরগুলো উলটেপালটে সাজালেই পাওয়া যাবে ওপরের কার্টুন ছবির সঙ্কেতের সমাধান।

গত সংখ্যার সমাধান

ভূতরা জ্যোতিষীকে যা দেখাতে আসে

হ র র স্কো প

গত সংখ্যার সঠিক শব্দ : স্কোয়ারফুট, পর্যবেক্ষণ, বিরহযাতনা, বিচারবিভাগ।

ঘোষক

গত সংখ্যার সমাধান

অ	ব	কা	শ		বি	ন্ধ্য	প	র্ব	ত
	ধ		রি	ক	শ		ই		ব
ক		র	ক	ম			প	য়	লা
থ		মে		লা	গ	স	ই		
ক	ত	শ	ত			তী		কা	জ
তা	লা		র			শ	ব	দা	হ
		জ	ল	পা	ন		ড়া		র
বা	স	না			র	সু	ই		ত
দা		র্দ		কা	ম	না		খ্যা	
ম	নো	ন	য়	ন		ম	ত্র	পা	ঠ

৭ মে সংখ্যার শব্দসন্ধানের প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতা :

মানু হোসেন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

তপনকুমার দত্ত, বড়জোড়া, বাঁকুড়া

প্রণবেশ রায়, বনহুগলি, কলকাতা

দেবসেনাপতি

শব্দসন্ধান

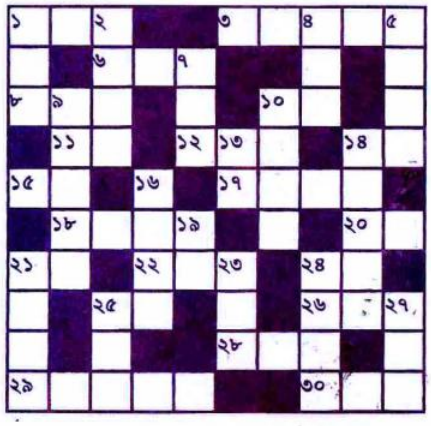

সংকেত : পাশাপাশি :

(১) কথাবার্তা। (৩) একটানা, অবিশ্রাম। (৬) বায়না, অগ্রিম মূল্য। (৮) বিধির—খণ্ডানো যায় না। (১০) মাটির নীচে যেখানে কয়লা, লৌহ এইসব থাকে। (১১) যা পোহালেই সূর্যের দেখা। (১২) 'একবার—দাও মা ঘুরে আসি।' (১৪) যিনি দান করেন। (১৫) পরিচর্যা। (১৭) খুশকি। (১৮) মঙ্গলকর। (২০) রোগ, অসুখ। (২১) বসন্ত ঋতুতে এর কুহর শোনা যায়। (২২) মহাভারতের শকুনির পিতা। (২৪) মৃতদেহ। (২৫) যাকে আপন করে নিতে হয়। (২৬) আম, রসযুক্ত। (২৮) ডেকে পাঠানো। (২৯) সিপাহি বিদ্রোহের বিখ্যাত নেতা। (৩০) ঢেউ।

উপর-নীচ :

(১) আরব দেশের ভাষা। (২) অধীন, পায়ে পড়ে থাকা। (৪) দিনের প্রথম নগদ বিক্রয়। (৫) 'কোন দেশেতে—সকল দেশের চাইতে শ্যামল।' (৭) নবাবের মতো চাল, নবাবের কাজ। (৯) অবিচ্ছিন্ন, ক্রমিক। (১০) দান, বিতরণ। (১৩) মূল্য। (১৪) এই ঘৃণ্য ব্যবসার ফলেই ক্রীতদাসের সংখ্যা একসময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। (১৬) নির্দোষ, অপরাধ নেই এমন। (১৯) আওয়াজ। (২১) হস্তিশালা। (২৩) লজ্জা পেয়েছে, লজ্জাযুক্ত। (২৪) গ্রীষ্মকালের উৎকৃষ্ট পানীয়। (২৫) যা কাঁচা হলে হাতে থাকে না। (২৭) একধরনের মশলা বা মুখশুদ্ধি।

জেরসেনাপতি

পুরস্কার

এই শব্দসন্ধানের সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে যে তিনজনের উত্তর 'আনন্দমেলা' পত্রিকা দফতরে প্রথম এসে পৌঁছবে, তাদের খাদিমের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে পুরস্কার। উত্তরদাতাদের সম্পূর্ণ ঠিকানা ও যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বর থাকলে ভাল হয়। উত্তর পাঠাতে হবে ২৮ জুন তারিখের মধ্যে।

জেরক্স প্রতিলিপি গ্রাহ্য হবে না

Model : 138007/8/9
Size : 2 - 5/ 12-1/9-11
Price : Rs. 185.00/ 163.00/150.00

Model : 210003/004
Size : 1 - 8/9-13
Price : Rs. 93.00/83.00

Model : 232201/2/9
Size : 7 - 10/ 11-13/1-5
Price : Rs. 60.00/ 75.00/90.00

Model : 269000/1/2/3
Size : 5 - 8/9-2/ 3-5/6-9
Price : Rs. 55.00/65.00/ 78.00/85.00

Khadim's Schooldays
SMARTNESS... পায়ে পায়ে

MRP (inclusive of all taxes) applicable in West Bengal only.

R K SWAMY/BBDO KSPL 406 2K

গত সংখ্যার উত্তর

১. ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের বাসিন্দা প্রধানমন্ত্রী নতুন সন্তানের পিতা হলেন এমন ঘটনা ঘটল ১৫১ বছর পর। ১৫১ বছর পর এমন ঘটনা ঘটল বলেই সংবাদমাধ্যমে এই চাঞ্চল্য।

২. ইউয়ান (১৬), নিকি (১৪) এবং ক্যাথারিন (১২)।

৩. পোপ জন পল। পোল্যান্ডের।

৪. আস্থা ভারতের শতকোটিতম জাতিকা। বাবা অশোক অরোরা, মা অঞ্জনা। জন্ম নয়াদিল্লির সফদরজঙ্গ হাসপাতালে।

৫. নিকোসিয়াতে অনুষ্ঠিত বিশ্বসুন্দরী (মিস ইউনিভার্স) প্রতিযোগিতায় ভারত-সুন্দরী লারা দত্তের বিজয়িনী হওয়া। এই জয়ই বাবাকে উপহার দিলেন ২১ বছরের লারা।

৬. ভুবনেশ্বরের শিশু অংশুমান দাস। ছোট্ট হাত দিয়েই সম্পূর্ণ দক্ষতায় সে উইভো অপারেট করতে পারে। সবথেকে কম বয়সে অ্যাপটেকের ৪৫ দিনের কোর্স সাফল্যের সঙ্গে শেষ করায় সে পেল বিদ্যা সার্টিফিকেট।

৭. ওইদিন তাইল্যান্ডের বর্তমান রাজা ভূমিবল অদুল্যদেজেস চাক্রি রাজবংশের সর্বকে দীর্ঘকাল রাজত্ব করা নৃপতি হিসেবে পরিগণিত হলেন। ওইদিন ভূমিবল এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম রামের বয়স স্পর্শ করেন। তাই ওই উৎসব।

৮. কটকের ছেলে সত্যনারায়ণ।

৯. বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার জামালপুর হাই স্কুল। ইঁদুরে ব্যাপকভাবে খাদ্যশস্য নষ্ট করায় বাংলাদেশ সরকারের 'ইঁদুর ধ্বংস কর্মসূচি'-র অঙ্গ হিসেবেই এই অভিযান।

১০. দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যান্ডে প্লিমথের কাছে এইচ এম এস কেমব্রিজে গত মে মাসে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির শিক্ষার্থীদের ট্রেনিংয়ের সময় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় সরকারি ব্যয়সঙ্কোচের নির্দেশ মানতে।

কুইজ

প্রশ্ন

১. ইয়টে চেপে ১৫১ দিন ১৯ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট ঝড়তুফান অগ্রাহ্য করে সারা বিশ্ব ঘুরে (আপউইন্ড রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড) এক নতুন রেকর্ড গড়লেন এই তরুণ। এই দীর্ঘ পথ একা পাড়ি দিতে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছেন, আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ থেকে বেঁচেছেন, অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন মেরুপ্রদেশে হিমশৈলের আঘাত থেকে। কে ইনি?

তমাল অধিকারী, বউবাজার, কলকাতা।

২. তাঁর আত্মবলিদানের শতবর্ষ পালিত হল ৯ জুন। রাঁচি জেলার উলিহাতু নামে এক প্রত্যন্ত গ্রামে এই উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় আদিবাসী কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রী জোয়েল ওঁরাও। কে এই শহিদ, যাঁর স্মরণে ওই অনুষ্ঠান?

কল্যাণ শীল, পালপাড়া, চন্দননগর।

৩. জেরুজালেমকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সেটি ছিল তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড। সিলিসিয়া (বর্তমানে তুরস্ক) নদী অতিক্রম করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যান হোলি রোমান সাম্রাজ্যের এই নৃপতি। কে তিনি? কবে ঘটে এই ঘটনা?

ঝুম্পা চৌধুরী, নাগেরবাজার, দমদম।

৪. রাজারাজড়ারা আগে নিজেদের শখ মেটাতে চিড়িয়াখানা তৈরি করেছেন এমন নজির অনেক আছে। কিন্তু জনসাধারণ সেই চিড়িয়াখানায় ঢুকে জীবজন্তুদের দেখে আনন্দ পাবে, এমন চিড়িয়াখানা এটিই প্রথম। কবে এটি খোলা হয়?

নিরাপদ গায়েন, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

৫. ফোর স্ট্রোক ইন্টারনাল কম্বাশান এঞ্জিনের উদ্ভাবক তিনি।

জন্ম ১৮৩২ সালের জুন মাসে। কে ইনি? কোন দেশের?

মিনতি দেবনাথ, রানাঘাট, নদিয়া।

৬. ঝরনা কলমকে হটিয়ে দুনিয়া জুড়ে এখন বলপয়েন্ট কলমেরই রাজত্ব। এর পেটেন্ট হাঙ্গারির এক সাংবাদিকের। কে ইনি। কবে তাঁর এই কলমের পেটেন্ট নেন?

দিয়া মজুমদার, শ্যামবাটী, শান্তিনিকেতন।

৭. বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা। ১৯৪৬ সালের জুনে মৃত্যু হয় তাঁর। বিশ্বে হেভিওয়েট বক্সিংয়ে তিনিই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে চ্যাম্পিয়ান হয়ে

সাড়া ফেলেন। কে ইনি? কোন দেশের।

জ্যোৎস্না পাল, রামপুরহাট, বীরভূম।

৮. ভারতীয় মহাকাব্যে উল্লিখিত এই স্থানটি বিখ্যাত হয়ে আছে এক যুদ্ধস্থল হিসেবে। পবিত্র শহর হিসেবে সেটি নতুন করে গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সম্প্রতি। ব্যয় হবে চার কোটি টাকা। তৈরি হবে সূর্যদ্বার, স্তম্ভে লেখা থাকবে গীতার উপদেশ, সংস্কার করা হবে ভীষ্মকুন্ডেরও। কোন স্থান? এখন এর অবস্থান কোথায়?

সুপ্রিয় চক্রবর্তী, রসুলপুর, বর্ধমান।

৯. প্যারাশুটে উত্তর মেরুতে অবতরণ করে ভারতের জাতীয় পতাকা তোলেন ইনি। স্কাই ডাইভিং-এ এই নজির স্থাপন করেন কে?

শ্যামল জানা, কদমতলা, হাওড়া।

১০. ৪৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট টানা শিস দিয়ে রেকর্ড করেন এই ভারতীয়। কে ইনি? কোন রাজ্যের?

ভাস্কর দত্তগুপ্ত, ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

১১. দোলকের গতি সম্পর্কিত সূত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন কোন বিজ্ঞানী?

প্রশান্ত ভৌমিক, গুপ্তিপাড়া, হুগলি।

১২. পৃথিবী-কেন্দ্রে সব বস্তুর ওজন কত?

বৃষ্টি দত্ত, পাইকপাড়া, কলকাতা।

১৩. নৃত্য ছিল তাঁর জীবন। আক্ষরিক অর্থেই। গত বইমেলায় যখন প্রকাশিত হল তাঁর গ্রন্থ 'নৃত্যরসে চিত্ত মম', তখন হাসপাতালে ডায়ালিসিস চলছে তাঁর। জুনের গোড়ায় মৃত্যু হয় তাঁর। কে এই নৃত্যশিল্পী?

সুলগ্না চট্টোপাধ্যায়, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

কুইজ

এবারের বিষয় : প্রতিবন্ধীরা যখন খ্যাতির শিখরে

প্রশ্ন

১. মধ্যযুগের এই ভক্তকবির গান আজও জনপ্রিয় ভারতের পথেপ্রান্তে। দৃষ্টিহীন এই সাধক কবির গান মনের দরজা খুলে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের। কে এই কবি, যাঁর ভজন আজও মুগ্ধ করে মানুষকে?

২. রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের বিখ্যাত কবি। মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র পর তাঁর রচিত একটি বইও সে-সময়ে আলোড়ন তুলেছিল বাংলা কাব্যজগতে। শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে মনোকষ্টে লিখেছিলেন—'বিভু কি দশা হবে আমার'। কে এই বাঙালি কবি?

৩. দুর্ঘটনায় নিতান্ত বালিকা বয়সেই একটি পা কাটা যায় তাঁর। কিন্তু দমেননি তিনি। জয়পুরী কৃত্রিম পা শরীরে লাগিয়ে শিখেছেন ধ্রুপদী নৃত্য। অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্রে। তাঁর অভিনীত একটি চলচ্চিত্র সারা ভারতে জনপ্রিয় হয় এবং পায় বিশেষ পুরস্কার। কে এই শিল্পী?

৪. নিজে বধির ছিলেন। কিন্তু তাঁর সুর দেশকালের গণ্ডি পেরিয়ে মাতিয়েছে সারা বিশ্ব। সারা বিশ্বের সঙ্গীতপ্রেমীর চোখে আজও সমান শ্রদ্ধেয় কে এই ব্যক্তি?

৫. বিরল প্রতিভা এই ব্যক্তিকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় তৈরি করেছিলেন চলচ্চিত্র 'ইনার আই'। চোখে যখন দেখতেন না, তখনও আশ্চর্য কৌশলে ছবি আঁকতেন এই শিল্পী। 'চিত্রকর', 'চিত্রকথা' তাঁর লেখা বই। শান্তিনিকেতনে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। কে এই চিত্রশিল্পী?

৬. পাহাড় ছিল তাঁর রক্তে। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েও সেই নেশা কাটেনি। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি ওঠেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে। ১৯৬৫-তে ভারত-পাক যুদ্ধে শরীরে এমন স্থানে গুলি লাগে, জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যান। তবু আজও আগের মতোই পাহাড়প্রেমী তিনি। পাহাড়ে নিজে উঠতে না পারলেও তাঁকে কখনও দেখা যায় হুইলচেয়ারে করেই হাজির বেস ক্যাম্পে বা কখনও মানস-সরোবর যাত্রীদের শিবিরে। তাঁর কলম সক্রিয় পাহাড় সংক্রান্ত লেখালিখিতে। তাঁর লেখা অন্যতম বিখ্যাত বই 'হায়ার দ্যান এভারেস্ট'। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কে এই মানুষটি?

৭. পৃথিবীর কোনও রং তিনি দেখতে পেতেন না, শুনতে পেতেন না কোনও শব্দের ঝঙ্কার, গানের সুর। তবু জীবন সম্পর্কে কোনও তিক্ততা নয়, মনের জোরে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা যায়, ডুব দেওয়া যায় সুন্দরের আরাধনায়। আর সে বার্তা মন্ত্রের মতো ছড়িয়ে দেওয়া যায় বিশ্বময়—নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন এই মহীয়সী নারী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ঘটেছিল তাঁর। কে ইনি?

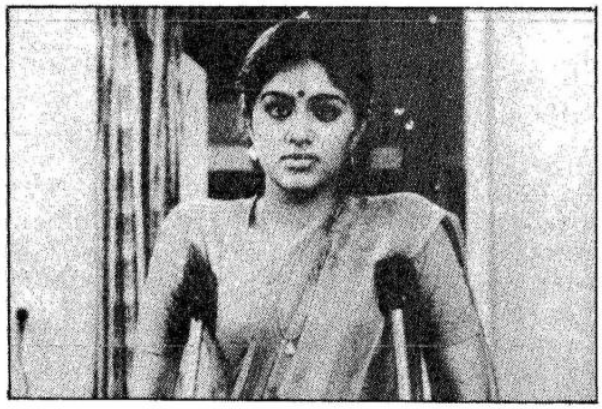

৮. চোখের দৃষ্টি হারান ছেলেবেলায়। সে আঘাত কাটিয়ে ওঠেন সঙ্গীতের মাধ্যমে। আজও জনপ্রিয় তাঁর কণ্ঠের 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে', 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে', 'মহাসিন্ধুর ওপার হতে' প্রভৃতি গান। অভিনয়েও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তিনি। কে এই বিখ্যাত শিল্পী?

৯. প্রথমে সকলেই ভেবেছিল অসম্ভব। সক্ষম হাত-পা নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষই যেখানে এই প্রণালী পেরোতে হিমশিম খায়, সেখানে বাঙালি এক শারীরিক প্রতিবন্ধী কোনওমতেই উত্তীর্ণ হতে পারবেন না এই কঠিন পরীক্ষায়। দুরূহ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হয়ে এই বাঙালি প্রমাণ করেছেন, মনের জোর ও ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে-কোনও বাধাই জয় করা যায়। কে এই সাঁতারু?

১০. এখন বিশ্বে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম এই প্রতিবন্ধী মানুষটি। দুরারোগ্য ব্যাধিতে নড়াচড়ার, এমনকী স্বাভাবিক ভাবে কথা বলার ক্ষমতাও নেই তাঁর। কিন্তু মনের জোরে চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানচর্চা ও দুরূহ বিষয় নিয়ে গবেষণা। প্রখর মেধাবী ও আদ্যন্ত রসিক এই বিজ্ঞানীর বিখ্যাত বই 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম'। কে ইনি?

১১. মুম্বইয়ে আয়োজিত গ্লোবাল টেলিসিস্টেমস্ ন্যাশনাল বি দাবা প্রতিযোগিতায় ফাইনাল রাউন্ডে প্রথম হলেন কে?

১২. প্রতিবন্ধী তিনি, ক্রাচ নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। তবু পাহাড়ের টানে শারীরিক বাধা অতিক্রম করে উঠেছেন গাড়োয়ালের ৭,৩০৮ মিটার উঁচু আবি-গামিন শিখরে। কে এই বাঙালি? কত সালে?

উত্তর

১. সুরদাস। হিন্দিতে সুরদাসের অর্থই 'অন্ধ গায়ক'। ২. 'বৃত্রসংহার' কাব্যের রচয়িতা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. 'নাচে ময়ূরী'-খ্যাত সুধা চন্দ্রন। ইনি দক্ষিণ ভারতের শিল্পী। ৪. 'নাইন্থ সিম্ফনি', 'মুনলিট সোনাটা'-খ্যাত বেঠোভেন। ৫. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ৬. এইচ পি এস আলুওয়ালিয়া। ৭. হেলেন কেলার। ৮. গায়ক ও অভিনেতা কৃষ্ণচন্দ্র দে। ৯. মাসুদুর রহমান বৈদ্য। ১৬ ঘন্টা ২৩ মিনিটে পার হন। ১০. স্টিফেন হকিং। ১১. মহারাষ্ট্রের স্বপ্নিল শা। আন্ধেরি স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এ আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ছিল অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশন ফর দ্য ব্লাইন্ড। ১২. বাবা মহেন্দ্র পাল। ১৯৯৪ সালের ৩০ অগস্ট।

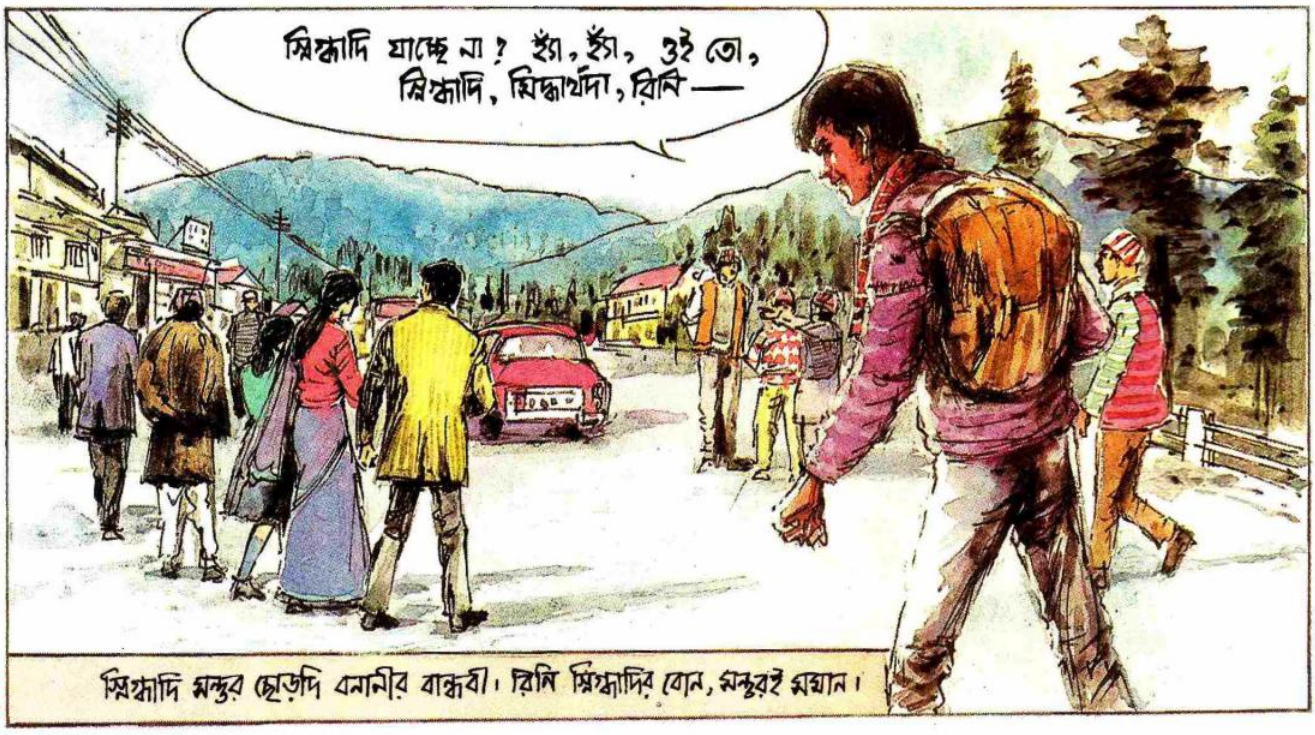
স্নিগ্ধাদি যাচ্ছে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো, স্নিগ্ধাদি, সিদ্ধার্থদা, রিনি —
স্নিগ্ধাদি মন্তুর ছোড়দি বনানীর বান্ধবী। রিনি স্নিগ্ধাদির বোন, মন্তুরই বয়ান।

মন্তু, তোরা কবে এলি? আর কে এসেছে?
আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এসেছি।

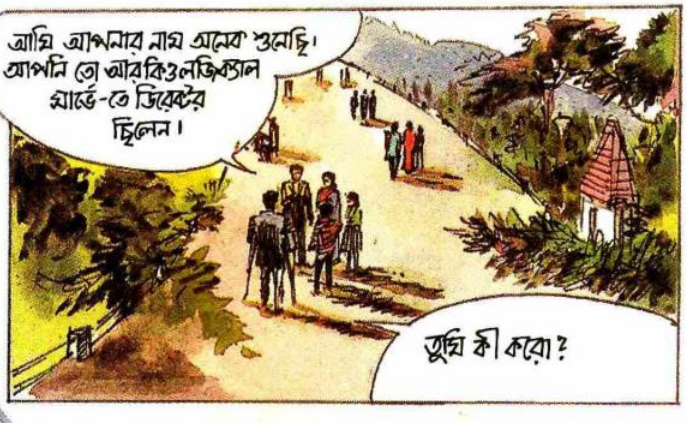
আমি আপনার নাম অনেক শুনেছি। আপনি তো আরকিওলজিক্যাল সার্ভে-তে ডিরেক্টর ছিলেন।
তুমি কী করো?

আমি কলকাতায় একটা কলেজে ইতিহাস পড়াই।

ইতিহাস পড়াও? তোমার সাবজেক্ট কী ছিল? ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি?
হ্যাঁ। আমি বৌদ্ধ আমল নিয়ে কিছু রিসার্চ করেছি।

তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই লাগল এবার আমাদের যেতে হবে।

চলুন না একসঙ্গেই যাওয়া যাক। আপনারা কোনদিকে যাবেন?

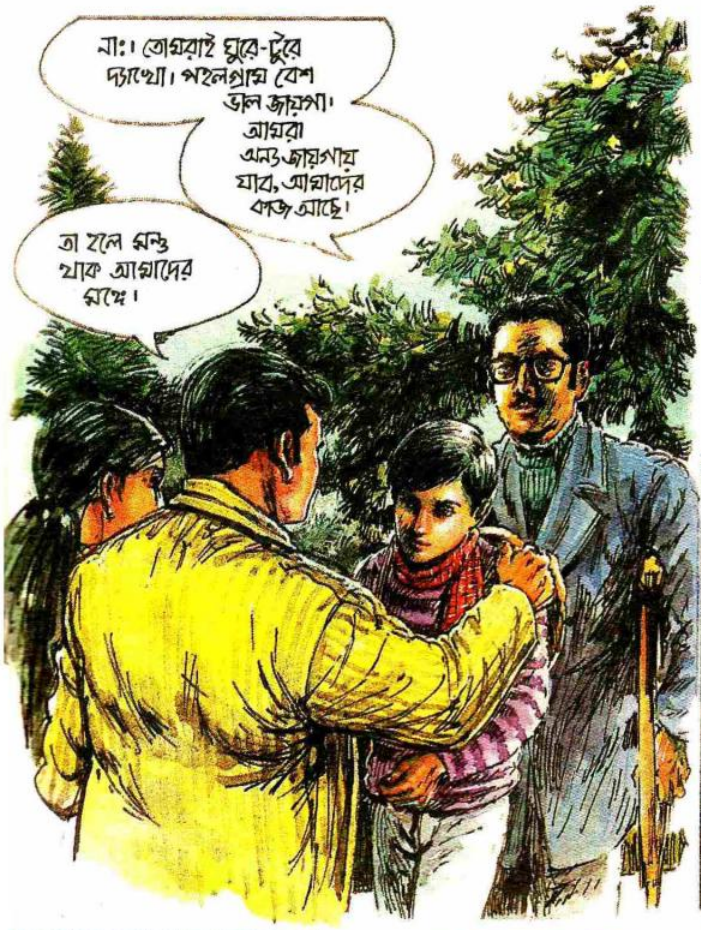

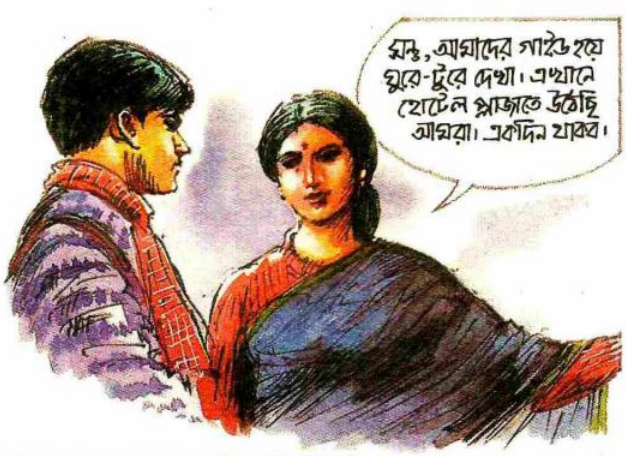

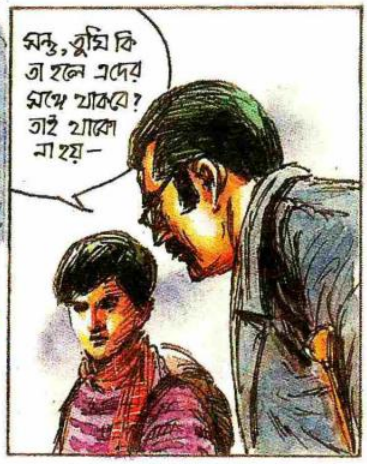

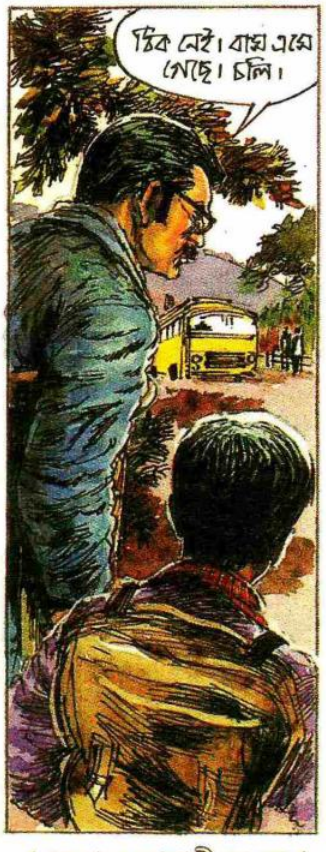

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আর্চি
আঃ। বেড়ে গন্ধ ছড়াচ্ছে।
তবে এখানেই খেয়ে নিই।
La Class DINING
গন্ধ ভাল। কিন্তু অত টাকা পকেটে নেই যে।
যা আছে দু'জনের খাওয়া হবে না!
ঠিক আছে। যে যার নিজেরটা দেব।
LA CLASS
তোমার খাবারটা কেমন?
দারুণ।
আমারটা একটু চাখবে?
না, তুমিই খাও।
খেয়েই দ্যাখো না একটু।
বেশ।
বাঃ, দারুণ খেতে।
আর কিছু খাবে?
না। এটা সত্যি ভাল লাগল।
আমারও।
LA CLASS
2-22
ভাল জিনিস ভাগাভাগি করে নেওয়াই ভাল। তবে আমার দু'ডলার তুমিই দাও।

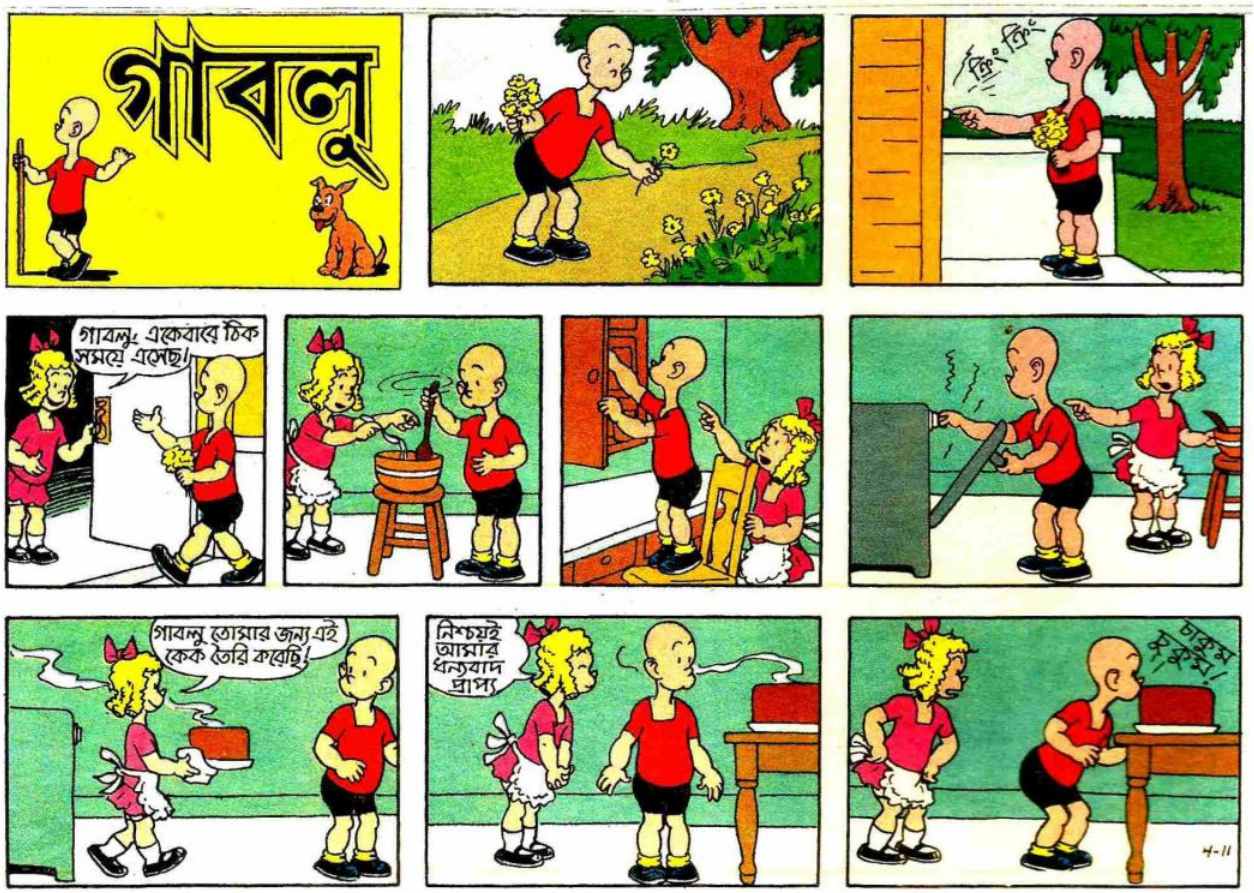

গাবলু
ক্রিং ক্রিং
গাবলু, একেবারে ঠিক সময়ে এসেছ।
গাবলু তোমার জন্য এই কেক তৈরি করেছি!
নিশ্চয়ই আমার ধন্যবাদ প্রাপ্য
চাকুম চুকুম!
4-11

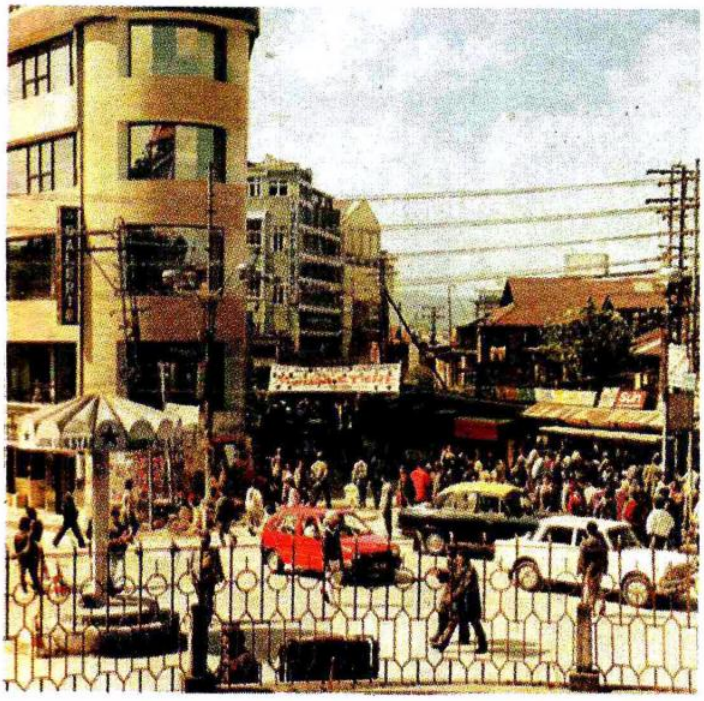

দূষিত শহর

দিল্লির পরিবেশসংস্থা 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' সম্প্রতি সারা দেশের শহরগুলিতে বায়ুদূষণের পরিপ্রেক্ষিতে একটা মানচিত্র তৈরি করেছে। প্রায় ৭০টি শহর নিয়ে সমীক্ষা করে তারা এক অদ্ভুত তথ্য পেয়েছে। সংস্থার দেওয়া হিসেব অনুযায়ী ৪৭ শতাংশ শহরে বায়ুদূষণ 'অত্যন্ত বেশি' পর্যায়ে, অর্থাৎ প্রমাণ দূষণের ১৫০ গুণ বেশি। ২৬ শতাংশ শহর পড়ছে 'বেশি' পর্যায়ে। ঘটনা হল, 'দূষণ নেই' এমন শহর মাত্র দু'টি শিলং ও তুতিকোরিন।

ভোপাল নিয়ে সিনেমা

সিনেমার নাম 'ভোপাল এক্সপ্রেস', নির্দেশক মহেশ মাথাই, অভিনয়ে আছেন নাসিরুদ্দিন ও জিনাত আমান। এটুকু লিখলে অনেকে পাতা উলটে দ্বিতীয়বার বিজ্ঞাপনটা দেখবেন না। অবশ্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পালটে যেতে পারে। যদি জানানো যায় এই সিনেমা তৈরির পটভূমিকা পনেরো বছর আগেকার মর্মন্তুদ ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি, যাকে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান পরিবেশগত বিপর্যয় মনে করা হয়। প্রসঙ্গত ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে মারণ মিথাইল আইসোসায়ানেট গ্যাস বের হওয়ার ফলে যে শুধু সেই সময়ই বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন তাই নয়, এখনও তার ফল ভুগতে হচ্ছে অনেককেই। 'ভোপাল গ্রুপ ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাকশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সতীনাথ সারেঙ্গির মতে এখন প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার মানুষের নিয়মিত ডাক্তারি সহায়তা দরকার হয়, যা সারা শহরে বলতে গেলে অপ্রতুল। শুধু বাতাসই নয়, দূষিত হয়েছিল মাটির তলার জলও। সম্প্রতি গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনাল ভোপালের কারবাইড কারখানা এলাকাকে অন্যতম 'গ্লোবাল টক্সিক হটস্পট' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ম্যালেরিয়া তাড়াতে মাছ

কলকাতা শহরে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে আছেন যেসব কর্তাব্যক্তি তাঁদের এখন নড়েচড়ে বসবার সময় এসেছে। কেননা বর্ষা আসার সময় হয়েছে। আর বর্ষা আসা মানেই জমা জল, মশার জন্ম ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। এখন মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুল প্রচারিত উপায়গুলি বাদ দিয়ে কিছু করার কথা ভাবলে, তাঁরা নিউইয়র্ক শহরে নেওয়া সাম্প্রতিকতম ব্যবস্থার কথা মাথায় রাখতে পারেন। নিউইয়র্কের স্বাস্থ্য-অধিকর্তা নিল কোহেন জানিয়েছেন যে, তাঁরা লক্ষ লক্ষ গাম্বুসিয়া মাছ শহরের যাবতীয় জলাধারে ছাড়বেন, যাঁরা শুধু মশার লার্ভা খায়ই তা নয়, সংখ্যায় বাড়েও খুব দ্রুত। গতবার এ কাজে ম্যালথিয়ন জীবাণুনাশক ব্যবহার করলেও এবার তাঁরা তা করছেন না। এর কারণ ম্যালাথিয়ান ব্যবহারের সম্ভাব্য পরিবেশগত বিপর্যয় নিয়ে বিতর্ক বাড়ছে।

উষ্ণতা কমাতে

পৃথিবীর আবহাওয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ও তার ফলস্বরূপ 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' কমাতে চিলি সরকারকে এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছেন একজন অস্ট্রেলীয় সমুদ্রবিশারদ ও একটি জাপানি প্রযুক্তি সংস্থা। তাঁদের মতে সমুদ্রের জলের অভ্যন্তরে যদি নাইট্রোজেন গ্যাস বহুল পরিমাণে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে এই সমস্যা মিটতে পারে। কিন্তু কীভাবে? প্রস্তাবটির পেটেন্ট স্বত্ব নেওয়া সিড্‌নি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ান জোনসের মতে, নাইট্রোজেন বেড়ে যাওয়া মানেই ফাইটোপ্ল্যাংকটনের বৃদ্ধি।

ঠাণ্ডা গাড়ির ভেতরে দূষণ

বায়ু দূষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি ব্যবহার করেন? ভুল করেন। বস্তুত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ির তুলনায় হেঁটে গেলে বা সাইকেলে চড়লেও দূষণে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম। আশ্চর্য লাগলেও এরকম তথ্যই জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষার রিপোর্টে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা শহরে নেওয়া এই সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, এসি গাড়ির ভেতরে বসে থাকা মানুষ বস্তুত বাইরে রাস্তায় থাকা লোকজনের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি দূষণে আক্রান্ত হন। ভয়ের কথা, বেনজিনের মতো ক্যান্সারদূষক বা কার্বন মনো অক্সাইডের পরিমাণ শহরের আবহাওয়ার তুলনায় এসি গাড়ির ভেতরে অনেক বেশি।

জয়ন্ত বসু

অক্টোপাসের জীবন

এটা একটা কাহিনী। জীবনকাহিনী। তবে কোনও মানুষের নয়। নিউজিল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে অক্টোপাস বাগানের মহিলা বাসিন্দা সে। তারই জন্ম থেকে বার্ধক্য নিয়ে তৈরি এই কাহিনীচিত্র। রয়েছে জীবন সংগ্রামের দৃশ্যও; সামুদ্রিক কাঁকড়া, বায়ু পরাগী পুষ্প, সামুদ্রিক প্রাণীদের ডিম, আতঙ্কগ্রস্ত কডমাছ—এসবের সঙ্গেই তার নিত্য সঙ্ঘর্ষ। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে সমুদ্রতাত্ত্বিক নাতালি মানাগের চমকপ্রদ বিবরণ। দেখা গেল ডিসকভারি চ্যানেল, ৪ জুন,রাত ৮টায়।

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

টাইটানিক নিয়ে

কোনওদিন ডুববে না বলে মনে হয়েছিল যে জাহাজ, সেই টাইটানিক ডুবেছিল হিমশৈলের ধাক্কায়। ১৯১২ সালের ১৪ এপ্রিল ছিল অভিশপ্ত সেই দিন। এই শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অহমিকার প্রতীক এই টাইটানিককে বলা হত 'আনসিঙ্কেব্‌ল', 'দ্য শিপ অব ড্রিমস'। কিন্তু নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস, প্রথম ধাক্কাতেই সলিলসমাধি ঘটল তার। হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ডুবে গেল বিশাল জাহাজটি। ২২২৪ জন যাত্রীর মধ্যে ১৫১৩ জন ডুবে মারা গেলেন।

এত মানুষের মৃত্যুর কারণ, প্রয়োজনীয় 'লাইফ বোট' ছিল না টাইটানিকে। আর লাইফ বোটে ওঠার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল ধনী যাত্রীদেরই। ধনী-দরিদ্রের বিভেদ চূড়ান্তভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল মৃত্যুর সময়েও। ৯ জুন শুক্রবার এ এক্স এন চ্যানেলে এই নিয়ে দেখা গেল 'এস ও এস টাইটানিক' অ্যাকশন ক্লাসিকস।

জয় সেনগুপ্ত

ফোটো : এ এক্স এন চ্যানেলের সৌজন্যে

ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎকার

জনমানবহীন অরণ্যে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর ভালুক, আর আমি নিশ্চিন্তে, নিরাপদে সেই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য উপভোগ করছি, সঞ্চয় করছি চিরদিন মনে গেঁথে রাখার মতো একটা দারুণ অভিজ্ঞতা! এরকম সৌভাগ্য ক'জনের হয়? বেশিরভাগের ক্ষেত্রে সেই দিনটাই হয়তো শেষের সেদিন। যাকে বলে ভয়ঙ্কর, ঘরে না-ফেরার দিন। ভালুকের আক্রমণ থেকে বেঁচে ফেরা, কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর হিমশীতল বিবরণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর তার সঙ্গে যদি যোগ হয় অভিজ্ঞদের অমূল্য সংযোজন? মুখোমুখি মানুষ আর ভালুকের ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি রোমহর্ষক অনুষ্ঠান দেখা গেল সম্প্রতি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে।

মিরক্যাটের জীবন

কেমনভাবে জীবনযাপন করে মিরক্যাটরা? একটু খোঁজখবর নিলেই জানা যাবে, মানুষের সঙ্গে এ-ব্যাপারে অনেক মিল আছে তাদের। এদের নিয়েই ভারী সুন্দর তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন রিচার্ড গস। এরকমই আর-একটি ছবি নিয়ে তিনি হাজির হচ্ছেন অ্যানিম্যাল চ্যানেলে। দক্ষিণ আফ্রিকার 'অ্যাডো এলিফ্যান্ট ন্যাশনাল পার্ক'-এ গিয়ে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে তিনি মিরক্যাটদের

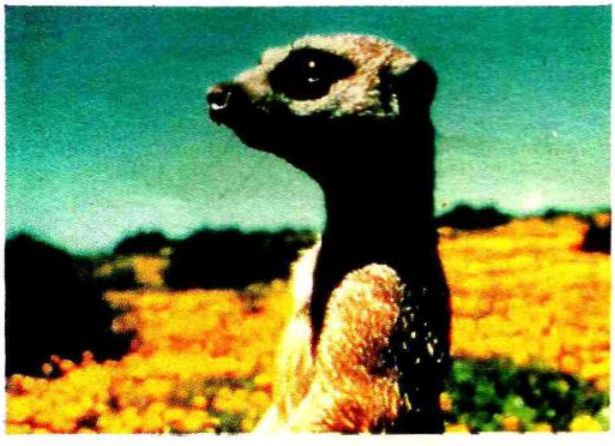

এমন সব ছবি তুলে এনেছেন, যেগুলো রীতিমত আকর্ষক আর অজানা তথ্যে ঠাসা। জানা যাবে কীভাবে মিরক্যাটরা নিজেদের পরিবার আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। রুদ্ধশ্বাস আর টানটান উত্তেজনায় ভরপুর অনুষ্ঠানটি দেখানো হল ১৭ জুন, রাত ১১টায়।

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

ফোটো : অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটের সৌজন্যে

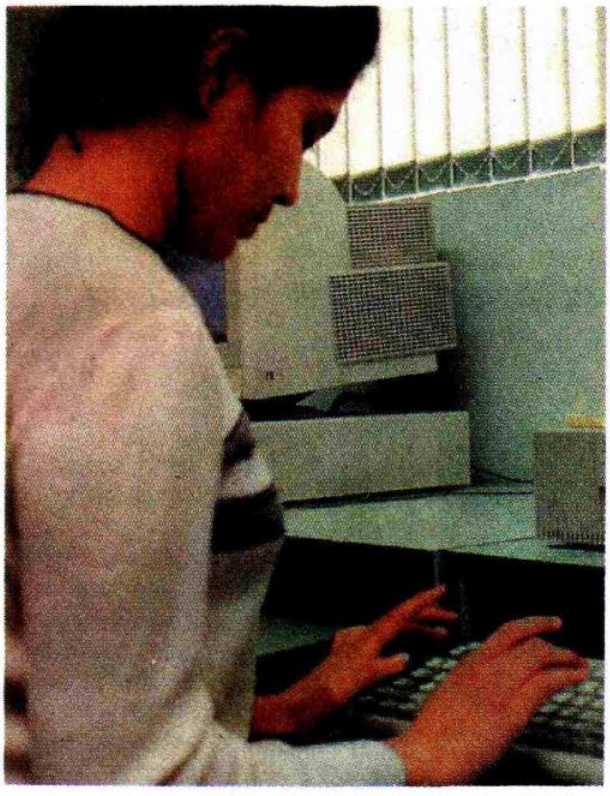

ইন্টারনেট টু

ইন্টারনেটের পর এবার 'ইন্টারনেট টু'। ১৪০টিরও বেশি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় পুরোদমে গবেষণা চালাচ্ছে ইন্টারনেট টু নিয়ে। তাদের পাশে আছে সরকার ও শিল্পমহল। উদ্দেশ্য উন্নততর ইন্টারনেট প্রযুক্তি তৈরি করা, যাকে বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার কাজে লাগানো যাবে। জোর দেওয়া হচ্ছে টেলি মেডিসিন, ডিজিটাল লাইব্রেরি, ভারচুয়াল লাইব্রেরি—এগুলোর ওপর যা বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রকল্পটি আসলে U C A I D বা University Corporation for Advanced Internet Develoment-এর। এটি কোনও একক নেটওয়ার্ক নয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, আঞ্চলিক ও জাতীয় নেটওয়ার্ক নিয়েই গড়ে উঠছে ইন্টারনেট টু। যেভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদানের উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটের জন্ম, ইন্টারনেট টুয়ের ব্যাপারটাও সেইরকমই। আশা করা হচ্ছে, বিভিন্ন নতুন তথ্য প্রযুক্তি যেমন I Pv6, মাল্টিকাস্টিং, কোয়ালিটি অব সার্ভিস (20S) ইত্যাদি এদের সাহায্যে আরও ভালভাবে ব্যবহার করা যাবে। ইন্টারনেট টুয়ের নিয়ন্ত্রণ যেমন আছে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাতে, তেমনই N.G.I বা নেক্সট জেনারেশন ইন্টারনেট প্রকল্পটির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা সরকারের। এই ইন্টারনেট টু ও এন. জি. আই আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করছে যেমন J.E.T বা জয়েন্ট এঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্স। ইন্টারনেট টুয়ের ভাল বোঝাপড়া আছে N.S.F বা 'ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন'-এর সঙ্গেও। এন. এস. এফের K.D.I বা 'নলেজ অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটেড ইন্টালিজেন্স' থেকে আর্থিক সাহায্যও পাচ্ছে ইন্টারনেট টু। বিশ্ববিজয়ের পথে ইন্টারনেট টুয়ের এই দ্রুত পদক্ষেপ আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে মার্কিন আধিপত্য এখনও অনেক দিন বজায় থাকবে।

মধুরিমার বিশ্বজয়

এতদিন আমরা জানতাম ইনটেল (Intel) শুধু মাইক্রোচিপই বানায়। কিন্তু খুদে বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারেও যে তাদের নজর আছে তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেল হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সংবর্ধনা সভায় যখন ইনটেলের দঃ এশিয়া শাখার ডিরেক্টর অতুল বিজয়াকর ছোট্ট মেয়ে মধুরিমার হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন। ১৪ বছরের মধুরিমা ভেঙ্কারেড্ডি অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরের সেন্ট অগাস্টিন স্কুলে পড়ে। ইনটেল আয়োজিত 'আই. এম. ই. এফ' অর্থাৎ 'ইনটেল ইনটারন্যাশনাল সায়েন্স অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিং ফেয়ার' যাকে বলা হচ্ছে 'বিজ্ঞানের ওলিম্পিক' সেই প্রতিযোগিতার জৈব রসায়ন বিভাগে তৃতীয় পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছে মধুরিমা। তাকে লড়তে হয়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মোট ৩৫ জন প্রতিযোগীর সঙ্গে, যারা তার মতোই স্কুলপড়ুয়া।

ইনটেলের পুরস্কার ছাড়াও মধুরিমাকে আমেরিকার এন্টোমোলজিক্যাল সোসাইটির তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ মেধা শংসাপত্র। তবে মধুরিমা সবচেয়ে খুশি হ্যানোভারে আয়োজিত 'ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইয়ং রিসার্চার্স ফর দি এনভায়রনমেন্টাল কম্পিটিশন'-এ যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়ে, যার খরচ যোগাবে জার্মানির ওয়েশ ব্যাঙ্ক। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যার উন্নয়ন ও গবেষণার কাজে নতুন প্রজন্মকে আরও বেশি উদ্যোগী করে তুলতে ইনটেলের এই প্রয়াস যে অত্যন্ত জরুরি, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

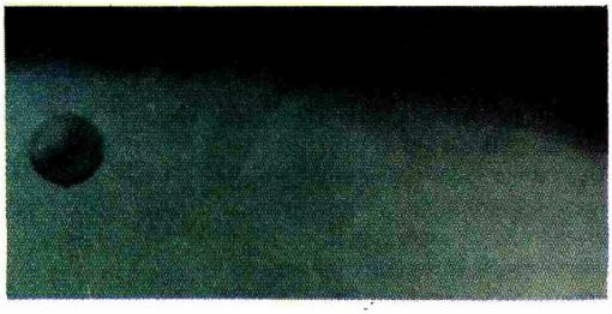

নেটের জালে লাল গ্রহ

নেটের ফাঁদে এবার ধরা পড়তে যাচ্ছে লাল গ্রহ। এই ঘোষণা 'নাসা'র। অচিরেই মঙ্গলকে ঘিরে ফেলবে একগুচ্ছ উপগ্রহ। উপগ্রহের জাল মূলত ব্যবহার করা হবে এই গ্রহেরই ওপর গবেষণার কাজে।

কেবলমাত্র মঙ্গলকেন্দ্রিক কোনও হাই-ডেফিনিশন টিভি চ্যানেলের সম্প্রচারের কাজ অথবা কোনও ভারচুয়াল রিয়েলিটি উপস্থাপনা সব কিছুই হতে পারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এজন্য নাসা মনে করে '১ মেগা বাইট পার সেকেন্ড' (Mbps) গতিতে তথ্য বিনিময় হলেই যথেষ্ট।

অবশ্য কিছু বাস্তব সমস্যাও আছে। পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য যেখানে উপগ্রহ আছে মাত্র ৪০০০০ কিলোমিটার ওপরে, মঙ্গলের ক্ষেত্রে সেখানে উপগ্রহটি থাকছে পাঁচ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোমিটার উচ্চতায়! স্বাভাবিকভাবেই পাঠানো সঙ্কেত এই লম্বা পথ পাড়ি দিতে দিতে কমজোরি হয়ে পড়বে আর তখন যোগাযোগ করাই হয়ে উঠবে মুশকিল। তথ্য যদি আলোর গতিতেও আসে, তবে পৃথিবীর মাটি ছুঁতে তার সময় লাগে পাক্কা ২০ মিনিট!

তৃষ্ণা বসাক

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশিপে কার মাথায় উঠবে জয়ের মুকুট

২৬ জুন থেকে শুরু হচ্ছে এই শতকের প্রথম উইম্বলডন প্রতিযোগিতা। এবারের টুর্নামেন্টের আকর্ষণও কম নয়। লিখেছেন তানাজি সেনগুপ্ত

এবারের ফরাসি ওপেনের প্রথম রাউন্ডে পরাজয়ের পর হতাশ গলায় পিট সাম্প্রাস বলেছেন, "আর কয়েকদিন পরেই আমার বয়স হবে ২৯ বছর। বুঝতে পারছি বয়স বাড়ছে।" সাম্প্রাসের হতাশা স্বাভাবিক। বাকি তিনটি গ্র্যান্ড স্লাম (উইম্বলডন, অস্ট্রেলীয় ও ইউ.এস. ওপেন) একাধিকবার জিতলেও ফরাসি ওপেন তাঁর কাছে এখনও অধরাই থেকে গেল। হতাশা অবশ্য সাম্প্রাসের মতো খেলোয়াড়ের বেশিদিন সঙ্গী হতে পারে না। সেজন্যই সর্বস্ব পণ করে তিনি ঝাঁপাবেন এবারের উইম্বলডনে। ফরাসি ওপেন তাঁকে বারবার ফিরিয়েছে আর উইম্বলডন তাঁকে দিয়েছে দু'হাত ভরে। গত শতাব্দীর নয়ের দশকের অর্ধেকের বেশি উইম্বলডন ট্রোফি তাঁর দখলে, ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫। আবার ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯—দু'দফায় তিনবার করে মোট ছ'বার এই প্রতিযোগিতা জিতেছেন সাম্প্রাস। আর একবার জিতলেই ছুঁয়ে ফেলবেন পুরুষ বিভাগে সবচেয়ে বেশিবার (সাতবার, ১৮৮১-৮৬, ১৮৮৯) উইম্বলডন জেতা উইলি রেনশয়ের রেকর্ড। কিন্তু সাম্প্রাসকে হাতছানি দিচ্ছে এক অনন্য, অসাধারণ রেকর্ড—রয় এমার্সনকে ছাড়িয়ে গিয়ে বিশ্বের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে ১৩টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়। এই মরসুমের প্রথম দুটি গ্র্যান্ড স্লাম, অস্ট্রেলীয় ও ফরাসি ওপেনে তিনি ব্যর্থ। প্রিয় উইম্বলডনেই হয়তো তাঁর জীবনের সেরা স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে।

উইম্বলডন জয় সব টেনিস খেলোয়াড়েরই স্বপ্ন, কিন্তু সবসময় নয়। চোখধাঁধানো গ্ল্যামার, প্রাইজ-মানি ইত্যাদিতে অন্য গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টগুলি এগিয়ে থাকলেও ঐতিহ্য ও মর্যাদায় উইম্বলডনের চেয়ে অন্যগুলি অনেক পিছিয়ে। টেনিসের মহারথীরা এখানে খেলার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। উন্মুখ কিন্তু এখানকার ঘাসের কোর্ট আদৌ তাঁদের পছন্দ নয়। সারফেস অনিশ্চিত, বল হঠাৎ হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, গড়িয়ে যায়। অনেকেই মানিয়ে নিতে পারেন না এই

পিট সাম্প্রাসকে হাতছানি দিচ্ছে অনন্য এক রেকর্ড

ঘাসের কোর্টে। পরিশ্রমী, প্রতিভাবান, বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা ইভান লেন্ডল একবারও এই ঘাসের রহস্য ভেদ করতে পারেননি। উইম্বলডন যিনি বেশ কয়েকবার জিতেছেন, সেই স্টেফি গ্রাফেরও প্রতিক্রিয়া, "প্রথম তিন বছর তো আমি মাঠে নেমেই পালাতে চাইতাম।" মজার কথা, এখনকার যেসব খেলোয়াড় এর রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন, তাঁরা জয়ও পেয়েছেন অনেকবার। যেমন, মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা উইম্বলডন সিঙ্গল্‌স জিতেছেন ন'বার, এখন পর্যন্ত সাম্প্রাস ছ'বার, বিয়ন বর্গ পাঁচবার।

অদ্ভুত ব্যাপার, এবারের উইম্বলডনের আসরে উপস্থিত থাকছেন এই তিনজনই। সাম্প্রাস এবং নাভ্রাতিলোভা খেলোয়াড় হিসেবে, বর্গ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। অবসর ভেঙে নাভ্রাতিলোভা ৪৩ বছর বয়সে তাঁর ২০ তম উইম্বলডন খেতাব জয়ের লক্ষ্যে এবার নামছেন। তবে সিঙ্গল্‌সে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার মারিয়ান ডে সোয়ার্ডকে সঙ্গে নিয়ে ডাবল্‌সে নামতে চান তিনি, মিক্সড ডাবল্‌সে তাঁর সঙ্গী হচ্ছেন (সম্ভবত) ভারতের মহেশ ভূপতি। মার্টিনা উইম্বলডনে ন'টি সিঙ্গল্‌স খেতাব ছাড়াও জিতেছেন সাতটি ডাবল্‌স এবং তিনটি মিক্সড ডাবল্‌স। সবচেয়ে বেশি খেতাব পাওয়া বিলি জিন কিংয়ের চেয়ে মাত্র একটি খেতাব কম। এবারের দু'টি খেতাব তাঁকে পদক সংগ্রহের শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারে। লড়াকু খেলোয়াড়টির নাম যেহেতু নাভ্রাতিলোভা, তাই আপাত অসম্ভব এই ঘটনাটি সত্যিও হতে পারে।

সাম্প্রাসের পরেই পুরুষদের সিঙ্গল্‌স জয়ের ক্ষেত্রে 'ফেভারিট' আমেরিকারই আন্দ্রে আগাসি। সাম্প্রাসেরই মতো আগাসি ফরাসি ওপেনের প্রথমদিকেই ছিটকে যান, তবু দক্ষতা, প্রতিভা ও

বিয়ন বর্গও এবার হাজির

উনিশ বছর পর উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে দেখা যাবে বিয়ন বর্গকে। নাভ্রাতিলোভার মতো অবশ্য খেলোয়াড় হিসেবে নয়। অতীতের চ্যাম্পিয়ান ও ফাইনালিস্টদের নিয়ে কোর্টে এক শোভাযাত্রায় তিনি থাকছেন। ১ জুলাই নতুন সহস্রাব্দ বরণ অনুষ্ঠানে পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে মোট ৬৭ জন খেলোয়াড়কে উপস্থিত করাচ্ছেন সংগঠকরা। পুরুষদের মধ্যে উল্লেখ্য তারকা জিমি কোনর্স এবং ইভান লেন্ডল ওই সময়ে উপস্থিত থাকতে পারছেন না। কোনর্সের অনুপস্থিতির কারণ জানা যায়নি। লেন্ডলের কাছে উইম্বলডন প্রিয় না হলেও, গল্‌ফ ম্যাচ আছে বলে তিনি থাকতে পারছেন না। মেয়েদের মধ্যে চারজন চ্যাম্পিয়ান থাকতে পারছেন না। তবে যাঁরা আসছেন, গ্ল্যামারের দিক দিয়ে উইম্বলডনকে আলো করে রাখবার পক্ষে যথেষ্টই।

উইম্বলডনের নানা ঘটনা

উইম্বলডনের ১২২ বছরের ইতিহাসে প্রায় প্রতি বছরই প্রতিযোগিতার সময় বৃষ্টি হয়েছে। মাত্র চারবার বৃষ্টিহীন পক্ষ কেটেছে।

□

এখন পর্যন্ত ব্যক্তিগত সিঙ্গলস্ খেতাব পুরুষ বিভাগে সবচেয়ে বেশিবার জিতেছেন উইলি রেনশ, ১৮৮১-'৮৬, এবং ১৮৮৯, মোট সাতবার। মহিলা বিভাগে এই কৃতিত্ব মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার, তিনি জিতেছেন ন'বার, ১৯৭৮-'৭৯, ১৯৮২-'৮৭ এবং ১৯৯০ সালে।

□

সবচেয়ে কম বয়সে উইম্বলডন জেতার কৃতিত্ব মহিলা বিভাগে লোটি ডডের, ১৮৮৭ সালে তিনি যখন চ্যাম্পিয়ান হন, তখন তাঁর বয়স ১৫ বছর। পুরুষ বিভাগে এই কৃতিত্ব বরিস বেকারের, ১৯৮৫ সালে তিনি প্রথম উইম্বলডন জেতেন ১৭ বছর বয়সে।

□

সবচেয়ে বেশি বয়সে উইম্বলডন জিতেছেন পুরুষ বিভাগে আর্থার গোরে, ১৯০৯-এ, ৪১ বছরে। মহিলা বিভাগে চার্লট কুপার স্টেরি, ১৯০৮-এ, ৩৭ বছর বয়সে।

□

উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে দর্শকের আসন আছে ১৩১২০টি, এর মধ্যে ৭৫টি আসন রয়াল বক্সে।

□

সবচেয়ে বেশি 'এস' সার্ভিস করার 'অল-টাইম রেকর্ড' গোরান ইভানসোভিচের। ১৯৯২ সালে সাতটি ম্যাচে তাঁর করা এস-এর সংখ্যা ২০৬টি।

□

১৯৯৮ সালে ১৩ দিনের উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় দর্শক উপস্থিত ছিলেন চার লক্ষ ২৪ হাজার ৯৯৮ জন। এটি সর্বকালীন রেকর্ড।

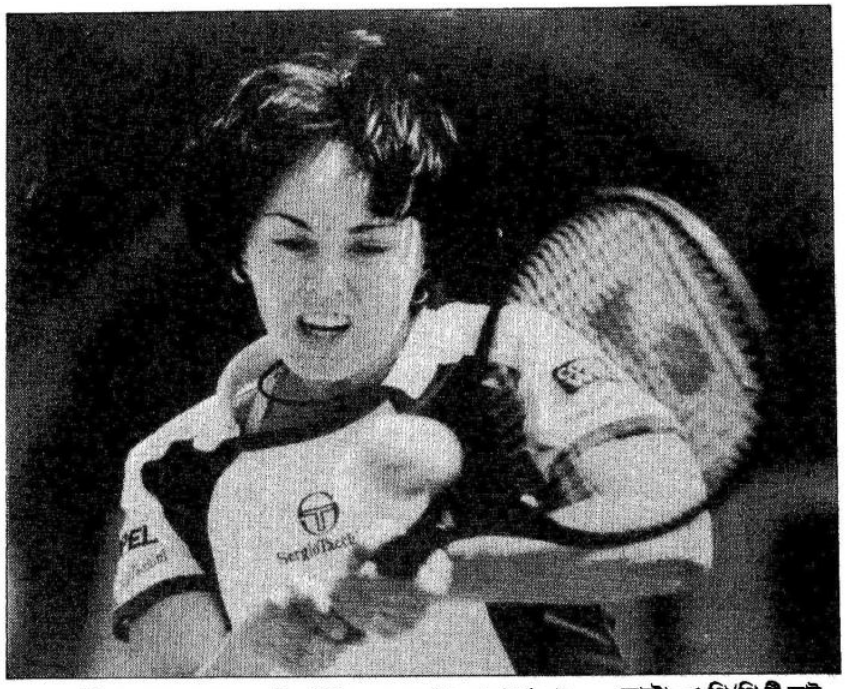

এবারের উইম্বলডন হতে পারে মার্টিনা হিঙ্গিসের ঘুরে দাঁড়ানোর টুর্নামেন্ট ফোটো : এ পি/পি টি আই

অভিজ্ঞতার নিরিখে আগাসিকে এগিয়ে রাখতেই হবে। আগাসি দীর্ঘদিন আগে ১৯৯২-তে উইম্বলডন জিতেছিলেন, গতবারেও অবশ্য তিনি ফাইনালে পৌঁছেছিলেন। পরাজিত হন সাম্প্রাসেরই কাছে। জিমি কোনর্সের পর টেনিসে আগাসির মতো ভাল 'সার্ভ রিটার্ন' কারও নেই। অথচ গতবার তিনি প্রচুর 'আনফোর্সড এরর' করেছিলেন। দ্বিতীয় সার্ভিসও খুব খারাপ হয়েছিল। আশা করা যায়, এবারে আর গতবারের ভুল করবেন না আগাসি। উইম্বলডনে এবার 'কালো ঘোড়া' হতে পারেন সুইডেনের তরুণ ম্যাগনাম নরম্যান। এখন বিশ্বের এক নম্বর, ২৪ বছরের নরম্যান ইতিমধ্যেই অনেক অঘটন ঘটিয়েছেন। হারিয়েছেন পিট সাম্প্রাসকেও, এবারের ফরাসি ওপেনের ফাইনালেও পৌঁছেছেন। ফর্মের বিচারে তাই তাঁকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। ১৯৯৭ এবং এবারের ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ান ব্রাজিলের গুস্তাভো কুয়ের্তেন দুর্দান্ত খেলছেন। তাই সম্ভাব্য বিজয়ীদের তালিকা থেকে তাঁকেও বাদ দেওয়ার উপায় নেই। সার্ভ এবং ভলিতে যিনি বাজিমাত করতে পারবেন, তিনিই উইম্বলডন জিতবেন, এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে। সেদিক দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্যাট্রিক র‍্যাফটার, নেদারল্যান্ডসের রিচার্ড ক্রাইচেক, স্পেনের কার্লোস মোয়া প্রাণপণ লড়াই করবেন।

মহিলা বিভাগে ফেভারিটদের তালিকায় থাকবেন মার্টিনা হিঙ্গিস, লিন্ডসে ডাভেনপোর্ট, অরান্থা স্যাঞ্চেজ ভিকারিও, মেরি পিয়ার্স, কন্‌চিতা মার্টিনেজ এবং অবশ্যই সেরেনা ও ভেনাস উইলিয়ামস। ১৯ বছরের মার্টিনার সময়টা এখন খুব ভাল যাচ্ছে না। পর পর কয়েকটি গ্র্যান্ড স্লামেই তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। সদ্য সমাপ্ত ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালেই বিদায় নেন হিঙ্গিস। তবু পাঁচটি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী প্রতিভাবান হিঙ্গিসকেই সম্ভাব্য জয়ীদের তালিকায় রাখতেই হবে। উইম্বলডন হিঙ্গিসের ঘুরে দাঁড়ানোর টুর্নামেন্টও হতে পারে। গতবারের উইম্বলডন বিজয়ী লিন্ডসে ডাভেনপোর্ট মানসিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী খেলোয়াড়। গতবারে তিনি হারান স্টেফি গ্রাফের মতো কিংবদন্তি খেলোয়াড়কে। সুতরাং ডাভেনপোর্ট এবারও যে জয়ের প্রস্তুতি নিয়েই উইম্বলডনে আসছেন তা বলাই বাহুল্য। স্পেনের অরান্থা স্যাঞ্চেজ ভিকারিও যে-কোনও সময় অঘটন ঘটাতে পারেন। উইম্বলডনে তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগতে পারে। ফ্রান্সের মেরি পিয়ার্স ফরাসি ওপেনে দারুণ খেলে উইম্বলডনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক রসদ সংগ্রহ করে নিয়েছেন। বাদ দেওয়া যাবে না কন্‌চিতা মার্টিনেজকেও। ফর্মে আছেন তিনি। আমেরিকার দুই বোন সেরেনা ও ভেনাস উইলিয়ামস 'তারকা বধ' করতে ওস্তাদ। সেরেনা ইতিমধ্যেই গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ান, দেখা যাক উইম্বলডনে তাঁদের 'র‍্যাকেট' কতটা ঝলসে ওঠে।

ফরাসি ওপেনের মতো উইম্বলডনেও ভারতের পক্ষে নিরাশার খবর, লিয়েন্ডার পেজ-মহেশ ভূপতি ডাবল্‌সে খেলছেন না। গতবার উইম্বলডন জিতে এঁরা আমাদের গর্বিত করেছিলেন। এবারে সেই মধুর আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম।

পাকিস্তানকে বারবার জয়ের গৌরব এনে দিচ্ছেন ইউসুফ ইউহানা

পাকিস্তানের তরুণ ব্যাট্সম্যান ইউসুফ ইউহানা বারবারই জয় এনে দিচ্ছেন পাকিস্তানকে। তাঁর মারকুটে ব্যাটিংয়ে ভেসে উঠছে জাভেদ মিয়াঁদাদের ছায়া।

লিখেছেন **সুজন ঠাকুরতা**

পাকিস্তানের বোলিং এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা। ওয়াসিম আক্রম, ওয়াকার ইউনুস, শোয়েব আখতার—এই তিনজনের দাপটে বিশ্বসেরা ব্যাটস্ম্যানরাও শঙ্কিত। সঙ্গে আছেন বৈচিত্র্যে-ভরা দুই স্পিনার সাকলিন মুস্তাক এবং মুস্তাক আহমেদ। কিন্তু পাক ব্যাটিং লাইন বোলিংয়ের মতো নয়। সঈদ আনোয়ার ও ইনজামাম-উল-হক ছাড়া দলে প্রতিষ্ঠিত তেমন কোনও ব্যাটস্ম্যান নেই। এই অবস্থায় পাকিস্তান ব্যাটিংকে নির্ভরতা দিতে এগিয়ে এসেছেন তরুণ ক্রিকেটার, ডান-হাতি ব্যাটস্ম্যান ইউসুফ ইউহানা। দারুণ টেকনিক, দক্ষ এই খেলোয়াড়টির মধ্যে জাভেদ মিয়াঁদাদের ছায়া লক্ষ করছেন অনেকেই। রামিজ রাজা, আসিফ ইকবাল, ইমরান খান প্রমুখ নামী ক্রিকেটার ইউহানার ব্যাটিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে নিজেকে ক্রমশ দলের পক্ষে অপরিহার্য করে তুলেছেন ইনজামাম-উল-হকের যোগ্য জুটি ইউসুফ ইউহানা।

সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুর্দান্ত খেললেন পাকিস্তানের মিড্ল অর্ডার ব্যাটস্ম্যান ২২ বছরের যুবক ইউহানা। ক্যারিবিয়ানদের মাঠে কোর্টনি ওয়াল্শ, কার্টলে অ্যামব্রোজ, রিওন কিং-এর দুর্ধর্ষ পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে চমৎকার খেলে পরপর দুটি টেস্টে শতরান করেন। কিংস্টন ওভালে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে পাকিস্তান যখন ৩৭ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে, সেই অবস্থায় ব্যাটিং করতে নেমে ১৪টি বাউন্ডারি সহ ১১৫ রান করেন ইউহানা ২৩৫ বল খেলে। ইউহানার দাপটেই দ্বিতীয় টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ করে পাকিস্তান। তৃতীয় টেস্টে অল্পের জন্য, বিতর্কিত সিদ্ধান্তে দল হেরে গেলেও, পাকিস্তানের ইনিংসকে ভদ্রস্থ জায়গায় পৌঁছে দেন ইউহানা চমৎকার শতরান করে। শেষ পর্যন্ত আক্রম-ইউহানার লড়াইকে ব্যর্থ করে দেন অ্যাডাম্স এবং ওয়াল্শ। পাকিস্তান হেরে গেলেও বিদেশের মাটিতে পরপর দুটি টেস্টেই দু-দুটি শতরান করে ইউহানা প্রমাণ করে দিয়েছেন, পাকিস্তান-ক্রিকেটে মিয়াঁদাদের উত্তরসুরি তিনিই। ইউহানার ব্যাটিংয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—বলকে ব্যাটের মাঝখান দিয়ে খেলা এবং ব্যাটকে বলের লাইনে নিয়ে যাওয়া। তিনি প্যাডে নয়, ব্যাটে খেলতে ভালবাসেন স্পিন বল। অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও ক্যারিবিয়ান সফরে প্রমাণ দিয়েছেন প্রতিভাবান ইউহানা, একবার নয়, বারবার।

শুধু টেস্টেই নয়, একদিনের ক্রিকেটেও সমান সফল ইউহানা। চোটের জন্য খেলতে পারেননি বিশ্বকাপ ফাইনালে। কিন্তু বিশ্বকাপের পর একদিনের ম্যাচে পাকিস্তানের হয়ে ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলে সকলের নজর কেড়েছেন। বিগত অক্টোবরে টরন্টো ক্রিকেট উৎসবে (ডি.এম.সি. কাপ) ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে কারিবিয়ান পেস বোলিংকে ছত্রভঙ্গ করে, দুর্দান্ত শতরান (১০৪) দলকে জেতান তিনি, এবং 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' নির্বাচিত হন। ওই ম্যাচে পাকিস্তান যখন ৬৮ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়েছিল, তখনই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যাট হাতে ঝলসে ওঠেন ইউহানা। এক কথায় পাকিস্তানের সংকটের মুহূর্তে বারবার ব্যাট হাতে দলকে নির্ভরতা দিয়েছেন এই তরুণ ক্রিকেটার। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কিছুদিন আগে কার্লটন অ্যান্ড ইউনাইটেড সিরিজেও নিজের দক্ষতা দেখান তিনি। মূলত ইউহানা ও রজ্জাকের কাঁধে ভর দিয়েই ফাইনালে ওঠে আক্রমের পাকিস্তান। ভারতের বিপক্ষেও এই সিরিজে একটি ম্যাচে 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' নির্বাচিত হন ইউহানা।

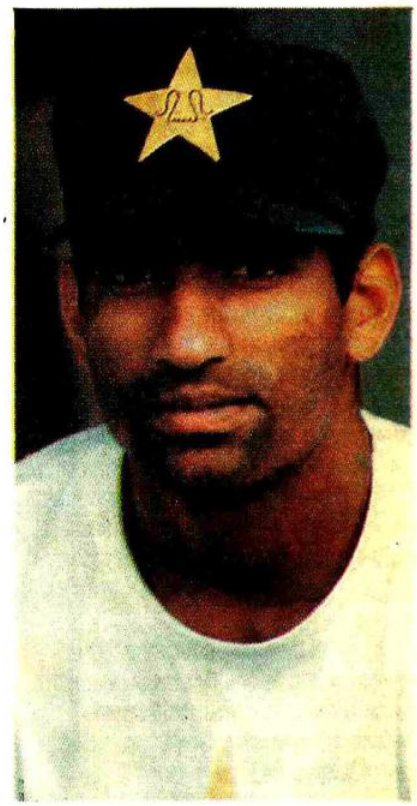

ছেলেবেলায় ইউহানা খেলা শিখেছেন জাভেদ মিয়াঁদাদের কাছে। মিয়াঁদাদ তাঁকে তৈরি করেছেন লড়াকু, নির্ভরযোগ্য ব্যাটস্ম্যান হিসেবে। ইউহানা আক্রমণে যেমন পটু, ডিফেন্সেও তেমনই দক্ষ। এখন ইউহানার খেলায় মিয়াঁদাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাচ্ছে। ভাল ফিল্ডার ইউহানা, 'রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস' দেখবার মতো। সাম্প্রতিকালে পাক ক্রিকেটে সেলিম ইলাহি মহম্মদ ওয়াসিম, হাসান রাজা প্রমুখ অনেক ব্যাটস্ম্যানই এসেছেন। কিন্তু দলে নিজের আসন পাকা করে নিয়েছেন ইউহানা। ওয়াসিম আক্রম ইউহানাকে বলেছেন, "তোমাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্ম্যান হতে হবে।" সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন জাভেদ মিয়াঁদাদের শিষ্য, আক্রমণের প্রিয়পাত্র, পাকিস্তানের তরুণ নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ইউসুফ ইউহানা। সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে শেষ বলে ছয় মেরে শুধু শতরানই করেননি ইউহানা, মনে করিয়েছেন তাঁর গুরু জাভেদ মিয়াঁদাদের কথা।

ফুলব্যাক

শতাব্দীর সেরা

ফুটবলার

মানস চক্রবর্তী

আজকের প্রজন্মের কাছে শৈলেন মান্নার নাম হয়তো তেমনভাবে পৌঁছয়নি। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে তিনি এক প্রবাদপুরুষ। খেলার মাঠের বাইরেও তাঁর জীবন নানা নাটকীয় মুহূর্তে উচ্ছল। বলিষ্ঠ ও ঋজু চরিত্রের এই মানুষটির পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে এই ধারাবাহিক রচনায়।

১৬ হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকের প্রথম ম্যাচেই ভারত বিস্ময়করভাবে ব্যর্থ হল। হারল ১-১০ গোলে। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক হার। অনেকটা ১৯৭৪-এ লর্ডসে ইংল্যান্ডের কাছে ৪২ রানে অল আউট হওয়ার মতো। কিংবা '৮২-এর দিল্লি এশিয়াডের ফাইনালে ভারতের হকি দলের পাকিস্তানের কাছে ১-৭ গোলে হারার মতো।

আজ প্রায় ৪৮ বছর পরেও সেই লজ্জাজনক হারের কারণ অনাবিষ্কৃত। সেই দলের কোচ ছিলেন রহিমসাহেব। ভারতের সর্বকালের সেরা কোচ। পরবর্তী কালে তাঁর কোচিং-এ ভারত মেলবোর্ন ওলিম্পিকে চতুর্থ স্থান পেয়েছিল। এশিয়াডে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল '৬২ সালে। প্রায় তেরো বছর তিনি ভারতের কোচ ছিলেন। এমন নয় যে, এই বিপর্যয়ের পর জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে তাঁকে চিরতরে অপসারিত করা হয়। এমনও নয় যে, ১০ গোল খাওয়ার জন্য ভারতের পরের টুর্নামেন্টগুলো থেকে অধিনায়ক শৈলেন মান্নাসহ একদল ফুটবলারকে বাদ দেওয়া হয়। কারণ এর পর আরও তিন বছর শৈলেন মান্না ভারতের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এবং তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত পর পর তিন বার কোয়েড্রাঙ্গুলার ফুটবলে (সিংহল কাপ) জয়ীও হয়েছে। তা হলে কি ধরে নিতে হবে হেলসিঙ্কির বিপর্যয় নেহাতই একটি দুর্ঘটনা?

না, পুরোপুরি দুর্ঘটনা মনে হয় বলা যাবে না। সেই সময়ের জীবিত ফুটবলারদের কাছ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা রীতিমত চাঞ্চল্যকর। আসলে সে-সময় ওপর-ওপর যতই ভারতীয় ফুটবলাদের মধ্যে ভাব-ভালবাসা থাকুক না কেন, ভেতরে-ভেতরে কিন্তু তাঁদের মধ্যে চরম মনোমালিন্য দেখা যায়। ভারতীয় ফুটবলাররা সেবার তিন ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। মোহনবাগান গ্রুপ, ইস্টবেঙ্গল গ্রুপ এবং সর্বভারতীয় গ্রুপ। দল ঘোষিত হওয়ার আগে কলকাতায় ক্যাম্প চলছে, তখন কানাঘুষো হতে লাগল টিমের অধিনায়ক মোহনবাগানের শৈলেন মান্না হলেও দলে তাদের ফুটবলার মাত্র তিনজন। বাকি দু'জন সাত্তার ও রুনু গুহঠাকুরতা। দলে না কি ছ'জনই ইস্টবেঙ্গলের। ব্যাক ব্যোমকেশ বসু, হাফ ব্যাক সমীর রায় (পল্টু), হাফে চন্দন সিংহ, উইঙ্গার বেঙ্কটেশ এবং সালে, আর ইনসাইড আমেদ খান। ওলিম্পিক দলের ১৮ জনের মধ্যে ছ'জনই একটা দলের এটা তো ইস্টবেঙ্গলের সভ্য-সমর্থকদের শ্লাঘারই বিষয়।

কিন্তু বাঙালির শত্রু বাঙালি। এই দলের একজনকে বাদ দিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল রাজনীতিতে নিজের স্থায়িত্ব কায়েম করার জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সচিব মণীন্দ্র (বেচু) দত্ত রায় প্যাঁচ কষলেন। অন্য রাজ্যের একজন ফুটবলারকে ঢোকাবার জন্য তিনি

পেছনে কলকাতা ময়দানের কাঠের গ্যালারি, সামনে শৈলেন মান্নার দল

ইস্টবেঙ্গলের একজন ফুটবলারকে কাটতে চাইলেন। কাগজে বেরিয়েও গেল খবরটা। কাগজ দেখামাত্রই ইস্টবেঙ্গলের সর্বময় কর্তা জ্যোতিষ গুহ বিপদ টের পেলেন। মুম্বইয়ে তাঁর নিজের লোক ছিল। তাঁর ডান হাত সিধু দত্ত একদিন খোঁজ নিয়ে এসে জানালেন, ইস্টবেঙ্গলের পল্টু রায়কে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। তাঁর বদলে টিমে নেওয়া হবে মহীশূরের সম্মুগমকে। খবরটা শুনে অবাক জ্যোতিষবাবু। কেননা সম্মুগম খেলতেন সেন্টার হাফে। লেফ্‌ট হাফ পল্টু রায়ের বদলে তাঁকে টিমে নেওয়া হবে কেন?

কয়েকদিন পরে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের এক কর্তা সাংবাদিকদের বললেন হেলসিঙ্কিগামী প্রত্যেক ফুটবলারকে মেডিক্যাল পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। বাতাসে ভাসল আর-একটা খবর, বছরখানেক আগে পল্টু রায় প্লুরিসিতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই কারণেই এই মেডিক্যাল টেস্ট। টিম রওনা দেওয়ার কথা কলকাতা থেকে। মেডিক্যাল পরীক্ষাও কলকাতায়। জ্যোতিষবাবু অবশ্য হাল ছাড়লেন না। তিনি পল্টু রায়কে নিয়ে সোজা চলে গেলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে। গিয়ে বললেন, "আপনি পরীক্ষা করে বলে দিন, পল্টু রায় ফিট কি না।"

বেচুবাবুরা একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন, প্লুরিসি হওয়া একজন প্লেয়ারের পক্ষে হেলসিঙ্কির ঠাণ্ডায় খেলা সম্ভব না। জ্যোতিষবাবু এই প্রশ্নটিও রাখলেন ডাঃ রায়ের কাছে। পল্টু রায়কে দীর্ঘক্ষণ দেখে ডাঃ রায় বললেন, "পুরোপুরি ফিট। বিশ্বের যে-কোনও আবহাওয়ায় ওর পক্ষে খেলা সম্ভব। হেলসিঙ্কির স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ওর কোনও অসুবিধে হবে না।" ডাঃ রায় অনেক আগে থেকেই চিনতেন পল্টু রায়কে। বছরখানেক আগে মহমেডান ম্যাচে একবার চোট পেয়েছিলেন পল্টু রায়। লতিফের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর বুকের পাঁজর ভেঙে যায়। সেই সময় চিকিৎসা করেন ডাঃ রায়। অল্প দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন পল্টু রায়। সেই সময় 'ক্যালকাটা ফিভার' বলে এক ধরনের জ্বর হত। কেউ-কেউ রটিয়ে দিয়েছিলেন পল্টুবাবুর প্লুরিসি হয়েছে। বেচু দত্ত রায়রা সেটাকেই হাতিয়ার করলেন।

যাই হোক, ডাঃ রায়ের 'ফিট সার্টিফিকেট' পাওয়ার পর জ্যোতিষবাবু সোজা চলে গেলেন আই এফ এ-র প্রেসিডেন্ট ভূপতি মজুমদারের কাছে। গিয়ে পালটা চাপ দিলেন, পল্টু রায়কে ওলিম্পিকে পাঠাতেই হবে। তখন বেচু দত্ত রায় পড়লেন মহাফাঁপরে। ডাঃ রায়ের সার্টিফিকেট অগ্রাহ্য করার মতো সাহস তাঁর ছিল না। আবার পল্টু রায়কে পাঠালে অন্য সব অঙ্কে গরমিল হয়ে যেত। কেননা এও রটেছিল, মহীশূরের হাফ ব্যাক সম্মুগমকে হেলসিঙ্কি পাঠানোর জন্য ফেডারেশনের এক কর্তা নাকি পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছেন। শেষপর্যন্ত ভূপতিবাবুর চাপেই ঠিক হল পল্টু রায়কে হেলসিঙ্কি পাঠানো হবে। এদিকে কোচ রহিম কলকাতা থেকে বিমানে যে ১৮ জনের দল নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন তাতে ঠাঁই হল না পল্টু রায়ের। তিনি গেলেন পরদিন ভারতের 'অ্যাথলেটিক্স টিমের সঙ্গে। গেলেন বটে, কিন্তু ওখানে পৌঁছে তাঁর নাম রেজিস্ট্রি হলই না। বহাল তবিয়তেই দলে ঢুকে গেলেন সম্মুগম।

আজ এত দিন পরে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের দলিল-দস্তাবেজ খুঁজে দেখতে গিয়ে দেখছি তাদের রেকর্ডে ভারতের ১৮ জনের দলে পল্টু রায়ের নামই নেই। আবার আই এফ এ-র স্মারক পত্রিকায় পল্টু রায়ের নাম রয়েছে। নেই মেওয়ালালের নাম। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের স্মারক পত্রে অবশ্য মেওয়ালালের নাম আছে। তার মানে পল্টু রায়ের যাওয়াটা শুধু বেড়ানোই বলা যেতে পারে। বলাই বাহুল্য, দুই জায়গাতেই নাম রয়েছে সম্মুগমের।

এই পরিস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা যদি ব্যাপারটাকে ভাল মনে না নিতে পারেন তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় কি? মাঠের মধ্যেই তাঁরা যদি সেই 'ক্ষোভ'কে উজাড় করার প্রকৃষ্ট জায়গা বলে মনে করেন তাঁদের দোষ দেওয়া যাবে না। ভারতের সঙ্গে তাঁরা 'অর্ন্তঘাত' করেছিলেন কি না আজ আর তা প্রমাণ করার সুযোগ নেই। আমরা সেই চেষ্টাও করছি না। তবে রহিমসাহেবদের টিম যে মাঠে নামার আগেই জতুগৃহ হয়েছিল তা তিনি টের পাননি।

সম্মুগম অবশ্য প্রথম একাদশে জায়গা পাননি। ভারতের টিম ছিল : গোলে বি অ্যান্টনি, দুই ব্যাক আজিজ ও শৈলেন মান্না, তিন হাফ ব্যাক লতিফ, চন্দন সিংহ এবং নুর মহম্মদ। পাঁচ ফরওয়ার্ড হলেন বেঙ্কটেশ, সাত্তার, মঈন, আমেদ এবং জে অ্যান্টনি।

দল গঠনেও, মনে হয়, ভুল ছিল। আগের বছর যাঁর গোলে ভারত ইরানকে ১-০ গোলে হারিয়ে এশিয়ান গেমসে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল সেই মেওয়ালাল কেন প্রথম দলে নেই তা আর এতদিন পরে উত্তর দেওয়ার মতো লোক কোথায়? মেওয়ালালের উচ্চতা কি আন্তর্জাতিক ফুটবলের পক্ষে অন্তরায় ছিল? রহিমসাহেব কি মনে করেছিলেন লম্বা মঈন তাঁর জায়গায় ভাল পারফরম্যান্স করতে পারবেন? এ-কথা ঠিক তখন অঙ্ক পুলিশ ভারত কাঁপাচ্ছে। মঈন তাদের গোলগেটিং সেন্টার ফরওয়ার্ড। পুলিশ দলের

১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে ভারতের 'মার্চ পাস্ট'। অধিনায়ক শৈলেন মান্না

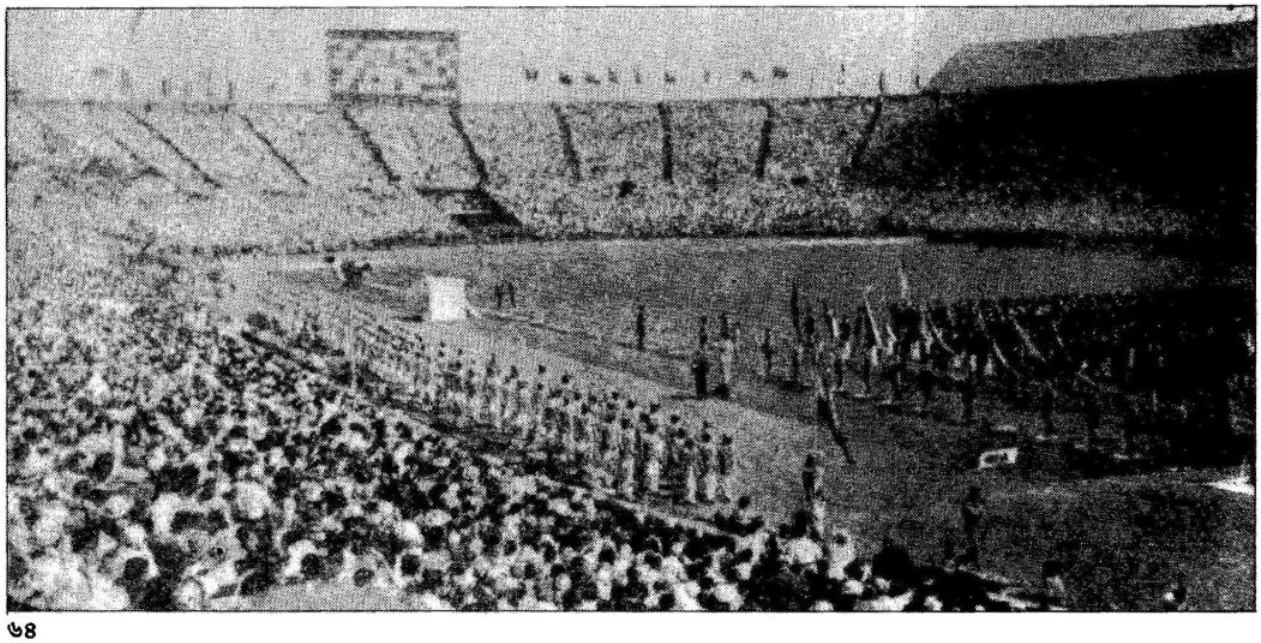

মান্নাকে বাদ দিয়ে তখনকার ভারতীয় দল গড়ার কথা ভাবাই যেত না

হয়ে মঈনের বেশ কিছু ভাল গোল ছিল। তাই হায়দরাবাদের লোক রহিম নিজের শহরের মঈনকে খেলাবার দুর্বলতাটাকে জয় করতে পারেননি, পারলে ভাল হত। কারণ সাত্তারের পাশে মেওয়ালাল কিংবা রুনু গুহঠাকুরতাকে নামালে ফরওয়ার্ড লাইন অ-নে-ক বেশি শক্তিশালী হত। তখন নিয়মিত গোলের মধ্যেই ছিলেন রুনু এবং মেওয়ালাল। আর কলকাতায় একসঙ্গে খেলার জন্য ওদের খেলার স্টাইলও এক। কম্বিনেশনও ভাল হত। পাঁচ ফরওয়ার্ডের মধ্যে একমাত্র মঈনই কলকাতায় খেলতেন না। আজ মনে হচ্ছে রহিমসাহেব মঈনকে নামিয়ে একেবারেই ঠিক কাজ করেননি। তখন তো পরিবর্ত ফুটবলার নামানোর নিয়ম ছিল না। কোনও একজন ক্লিক না করলে তাঁকে বসানোর উপায় ছিল না। একেবারে ক্রিকেটের মতো ব্যাপার।

দ্বিতীয় কারণ হল, হেলসিঙ্কির আবহাওয়া। সেবারের ওলিম্পিক জুন মাসে হলেও হেলসিঙ্কিতে তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। পুলওভার পরে খেলতে পারলে ভাল হয়। ওইরকম ঠাণ্ডায় অনভ্যস্ত ভারতীয় দল যে মাঠে নেমে অসুবিধেয় পড়বে, তা অনুমান করে ওলিম্পিকের পাঁচ দিন আগে নয়, উচিত ছিল, ১৫ দিন আগে সেখানে চলে যাওয়া। তার ওপর, তখনও ভারতীয় দল বুট পরে খেলা অভ্যস্ত করেনি, খালি পায়ে ইউরোপের প্রথম সারির দল যুগোস্লাভিয়াকে আটকানো সত্যিই মুশকিল ছিল।

তবে সবচেয়ে বড় ভুলটা হয়েছিল সিস্টেমে। ততদিনে ইউরোপে থার্ড ব্যাক সিস্টেম চালু হয়ে গিয়েছে। পাঁচ ফরওয়ার্ডকে আটকানোর জন্য দুই ব্যাক আর তিন হাফ ব্যাক আর যথেষ্ট ছিল না। এক জন হাফকে কমিয়ে তিন ব্যাক করে ৩-২-৫ সিস্টেমে খেলার চল হয়েছে তখন ইউরোপে। রহিমসাহেব কিংবা শৈলেন মান্নারা যে ব্যাপারটা জানতেন না তা নয়। শৈলেন মান্না বলছিলেন, "আমরা রহিম সাহেবকে বলেওছিলাম তিন ব্যাকে খেলতে। কিন্তু উনি রাজি হলেন না। আজ মনে হচ্ছে তিন ব্যাকে না খেলাটাই বড্ড ভুল হয়েছিল।" শুধু ভুল নয়, কালের বিচারে, ঐতিহাসিক ভুল।

ম্যাচটা সম্পর্কে শৈলেন মান্নার স্মৃতি এখনও টান-টান। যতই হোক তিনিই তো অধিনায়ক। "যুগোস্লাভিয়া শেষপর্যন্ত ফাইনালে দুর্ধর্ষ হাঙ্গারির কাছে এক গোলে হেরেছিল। কিন্তু ওদের টিম যে অত ভাল তা মাঠে নামার আগে জানতাম না। প্রথম ২৫ মিনিটে কোনও গোল হয়নি। স্থানীয় দর্শকেরা আমাদের প্রাণপণ লড়াইকে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু তারপর শুরু হল গোলের লাইন। যুগোস্লাভিয়া গুনে গুনে ১০ গোল দিল। শুনলে হয়তো বিশ্বাস হবে না, সেদিন আমাদের দেশের মান অনুযায়ী আমি আর গোলকিপার বি অ্যান্টনি বেশ ভাল খেলেছিলাম। কিন্তু সেই খেলা যুগোস্লাভিয়ার মতো উন্নত মানের টিমকে রোখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আমরা কলকাতা ফুটবলে ৫০ মিনিটের ম্যাচ খেলতে অভ্যস্ত ছিলাম। ৯০ মিনিটের দম আমাদের ছিল না। তবে তার মানে এই নয় যে, দম থাকলে আমরা জিতে যেতাম। স্কিল এবং ট্যাকটিক্সের দিক থেকে ওরা অনেক উন্নত ছিল। ১০ গোল কেন, আরও বেশি গোল হলেও বলার কিছু ছিল না। ওদের অধিনায়ক ছিল সেন্টার হাফ মিটিক। সেই-ই খেলাটা পরিচালনা করত। ফরওয়ার্ডে ছিল জেবেক বলে একটা ছেলে। ওরকম ফরওয়ার্ড খুব কমই দেখেছি। ওরাই কাত করে দিল আমাদের।

"তবে সেবার চোখ ভরে দেখেছিলাম হাঙ্গারির খেলা। শতাব্দীর অন্যতম সেরা দল। পুসকাস, হিদেকুটি, বোদিক—সবাই মহাতারকা। ওঁদের খেলা দেখে বুঝেছিলাম ফুটবল কোথায় পৌঁছে গিয়েছে। সুপারস্টারদের খেলার ছটায় উপস্থিত সকলের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। টকটকে লাল জার্সি পরা হাঙ্গারির ফুটবলারদের মনে হচ্ছিল যেন দেবদূত।

"যুগোস্লাভিয়ার ১০ গোলের পর ভারত একটা সান্ত্বনা গোল করেছিল। যে অ্যান্টনির শট গোলকিপারের হাতে লেগে ফিরে এলে গোল করেছিল আমেদ খান। ভারতীয় দল এবং তাদের কোচ রহিমসাহেবকে হেলসিঙ্কি ওলিম্পিক থেকে একটা বড় শিক্ষা নিয়ে ফিরতে হল। শুধু আক্রমণ করেই ফুটবল খেলা যায়া না। দরকার উপযুক্ত রক্ষণ। পরবর্তী সময়ে রহিমসাহেব আমাদের সেই শিক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন বলেই ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগের সূচনা হল তারই পর থেকে। আমরা পরপর চারবার কোয়েড্রাঙ্গুলার ফুটবলে চ্যাম্পিয়ান হলাম। '৫৬ সালের ওলিম্পিকে হলাম চতুর্থ। আর তারপর '৬২ সালে তো আবার এশিয়ান গেম্সে চ্যাম্পিয়ানই হলাম।"

আসলে বন্যার পর পলি জমে। সেই জমিতে ভাল ফসল হয়।'৫২-এর হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে যুগোস্লাভিয়ার বন্যায় ভেসে যাওয়া ভারতীয় ফুটবলের ওপর যে পলি পড়েছিল তা থেকেই ফসল তুললেন সৈয়দ আব্দুর রহিম। (ক্রমশ)

খেলার খবর

আবার লি-হেস

শুধুই খারাপ খবর নয়, আবার একটা ভাল সংবাদও শোনা যাচ্ছে। ভারতীয় টেনিস তারকা-জুটি লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতিকে খুব সম্ভবত সিডনি ওলিম্পিকেই আবার একসঙ্গে কোর্টে দেখা যাবে। এই আশার কথা শুনিয়েছেন স্বয়ং লিয়েন্ডার। গত মরসুমে সার্কিটে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন এই জুটি। প্রথম ভারতীয় জুটি হিসেবে জিতেছিলেন পরপর দুটি গ্র্যান্ড স্লাম— ফরাসি ওপেন এবং উইম্বলডন। রানার্স হন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ইউ.এস ওপেন এবং ওয়ার্ল্ড ডাবল্‌স প্রতিযোগিতায়। ডাবল্‌সের সিঙ্গল্‌স র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের এক নম্বর হওয়ার কৃতিত্ব দেখান লিয়েন্ডার, দু'নম্বর হন মহেশ। ভারতীয় টেনিসের ইতিহাসে অভাবনীয় সব রেকর্ড। এই জুটির বোঝাপড়া অসাধারণ। দু'জনে মিলে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ২৩১টি ম্যাচ, জিতেছেন ১৮১টি, হার ৫০টিতে। সাফল্যের শতকরা হার ৭৮.৩৫। এই সফল জুটিই এ-বছরের শুরুতে ভেঙে যায় পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে। তার ফলে অন্য সঙ্গী নিয়ে খেলে দু'জনেই একের পর এক ব্যর্থ হন। গর্বিত হওয়ার সুযোগ হারাই আমরা। সম্প্রতি চোটের জন্য উইম্বলডন খেলতেই পারছেন না লিয়েন্ডার। তিনিই জানিয়েছেন, "আমি নিজে মহেশের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটাব।" আশা করা যায়, সিডনি ওলিম্পিকেই আবার এই ভারতীয় জুটি কোর্টে ঝড় তুলবেন।

আরও এক সম্মান ওয়ালশের

আপাতত ক্রিকেট খেলা ভালই উপভোগ করছেন কোর্ট্‌নি ওয়াল্‌শ। তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী কার্ট্‌লে অ্যামব্রোস চলতি ইংল্যান্ড সফরের পরেই অবসরের কথা ঘোষণা করলেও ওয়াল্‌শ আরও কিছুদিন খেলবেন বলেই মনে হয়। সবচেয়ে বেশি টেস্ট-উইকেট নেওয়ার বিশ্বরেকর্ড করার পরও তিনি প্রায় প্রতি ম্যাচেই উইকেট পাচ্ছেন। ৪৫০ উইকেট তাঁর সংগ্রহে এল বলে! ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক এক সংস্থা তাঁকে শুভেচ্ছা-দূত মনোনীত করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি জানান, ওয়াল্‌শের দীর্ঘ এবং মসৃণ ক্রিকেট জীবনের কথা স্মরণে রেখেই তাঁকে এই সম্মানের যোগ্য মনে করা হয়েছে। ওয়াল্‌শ জানিয়েছেন, "আমি রীতিমত সম্মানিত বোধ করছি। এই জটিল পৃথিবীতে শিশুদের জন্য অনেক কিছু ভাবার এবং করার আছে। আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী এখন থেকে তা করব।" প্রসঙ্গত বলা যায়, ৩৭ বছরের ওয়াল্‌শ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত। এবার সারা বিশ্বই তাঁর কাজের ক্ষেত্র হয়ে উঠল।

ঐতিহাসিক ২৭ জুন

খুব সম্ভবত দিনটা ঐতিহাসিকই হতে চলেছে বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে। কারণ, ওই ২৭ জুনই লর্ডসে আই.সি.সি-র সভায় বাংলাদেশকে দশম টেস্ট খেলিয়ে দেশের মর্যাদা দেওয়ার কথা। সুনীল গাওস্করসহ আই.সি.সি'র টেকনিক্যাল কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাই এগ্‌জিকিউটিভ বোর্ডের কাছে সুপারিশ করেছেন, বাংলাদেশকে এই 'এলিট গ্রুপ'-এ আনা যেতে পারে। এশিয়া কাপে বাংলাদেশের হতাশজনক পারফরম্যান্স দেখে অনেকেই তাদের এই গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী নন। কিন্তু যুক্তিটা বোধ হয় মানা যায় না। গত বিশ্বকাপে বাংলাদেশ চমৎকার খেলেছিল, বাঙালি ছেলেদের কৃতিত্বে আমরাও গর্বিত হয়েছিলাম। টেস্ট খেলিয়ে দেশের মর্যাদা পেলে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই নিজেদের আরও উপযুক্ত করে তুলবে।

কোচিংয়ে রেকর্ড

ক্লাব তাঁকে ছাড়তে চায়নি। মাঝে-মাঝে ক্লান্ত লাগে বলে তিনি নিজেই কোচিং ছাড়ছেন। ৩৯ বছর ধরে ফ্রান্সের প্রথম ডিভিশনের ক্লাব অক্সেরেতে কোচের দায়িত্বে আছেন গাই রাউক্স। এই মরসুমের শেষে বিদায় নিচ্ছেন তিনি। রাউক্স বলেছেন, "ক্লাব ছাড়তে আমারও মন চাইছে না। কিন্তু আমার ক্লান্তির জন্য ক্লাবের কোনও ক্ষতি হোক আমি তা চাই না। তাই এই সিদ্ধান্ত।" ১৯৬১ সাল থেকে এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত তিনি। ক্লাবকে এনে দিয়েছেন বহু সম্মান। তারই স্বীকৃতিতে ক্লাব তাঁকে এতদিন কোচের দায়িত্ব দিয়েছে। নিঃসন্দেহে ইউরোপের ক্লাবের ইতিহাসে এটা একটা রেকর্ড।

দর্শক

ঋতু অনেক,একই সাবান,সুলভ দাম।

বিভিন্ন মরশুমে আমাদের ত্বক নানারকম কার্যকারণ ও পদার্থের সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রীষ্মে আসে তাপ ও ঘামের প্রকোপ, শীতের সঙ্গে সঙ্গে আসে শুষ্কতা আর বর্ষাতে নানারকম ত্বকের সংক্রমণ। মেডিমিক্স-এ খাঁটি নারকোল তেলে থাকা 18-টি ভেষজের গুণ ত্বক ও চুল রাখে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, আর্দ্রতাময় ও দীপ্ত - সারাটা বছর ধরে, সবচেয়ে কম খরচে।

ভেষজ	ভেষজের ক্রিয়া
কুটজা, চোপচিনি, ভিডঙ্গ ও জ্যোতিষ্মতী	সৌন্দর্যবর্দ্ধক
উশীরম, সারিবা ও ধান্যকা	ঘামাচিনাশক
গুগ্‌গুল, দেবদারু ও নিম্বত্বক	জীবাণুনাশক
চিত্রকা ও দারুহরিদ্রা	ব্রণরোধক
বনার্দ্রকা, কৃষ্ণজীরকা ও জীরকা	ডিওডোর‍্যান্ট
বচা, বাকুচি ও যষ্টিমধু	খুসকিনাশক

100% ভেজিটারিয়ান সাবান। খাঁটি নারকোল তেলে তৈরি, এমনকি সমুদ্রের জলেও বেশি ফেনা হয়।

পরিপূর্ণ আয়ুর্বেদিক স্নানের জন্যে

পরিবারের প্রিয়

মেডিমিক্স

সাবান

75 এবং 125 গ্রামের প্যাকে পাওয়া যায়।

www.medimixindia.com

Pen a Trail/DD-60/Ben

ANANDAMELA 21 JUNE 2000 REGD NO. WB/CC/264
MH/MBI-SOUTH/683/97 TN/MS/(C) 731. RS. 10.00

আপনার জামাকাপড় কি উজালা সাদা?

একমাত্র উজালা সুপ্রীমে আছে অভিনব **ইনস্টা হোয়াইটেনিং সিস্টেম**™(IWS), যা আপনার জামাকাপড়ে এনে দেয়,এক চোখধাঁধানো উজ্জ্বলতা। এবং উজালার এমনই শক্তি যে লিটার জলে মাত্র চার ফোঁটাই যথেষ্ট। তাই কেবল উজালাই দিতে পারে এক নতুন সাদা - উজালা সাদা।

শুভ্রতার নতুন রং

A product of Jyothy Laboratories Ltd. উজালা সুপ্রীম এখন বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে।